সোনার তরীর দিগদর্শন

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
ইন্দ্রলোক প্রকাশণী
৬নং শরৎ বসু রোড,
কলিকাতা-২০।

প্রচ্ছদপট শিল্পী--প্রণব বিশ্বাস।

মূল্য--তিন টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত
ওরিয়েন্টাল পিপল্‌স্‌ প্রেস,
৪৮নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ),
কলিকাতা-২৫।

প্রাপ্তি স্থান ঃ
ইন্দ্রলোক প্রকাশণী
৬নং শরৎ বসু রোড্‌
কলিকাতা-২০

স্বর্গতা মাতৃদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

কবিতা হচ্ছে অনুভূতির বস্তু। এই অনুভূতি জীবনের একটি বিশেষ অংশ থেকে উৎসারিত হয় না, সমগ্র জীবনের রস পান করে এই অনুভূতি কাব্য-সৃষ্টির শক্তি জোগায়। সমগ্র জীবনের কথা এই জন্যেই বলেছি যে, যে গোটা অখণ্ড ব্যক্তি-সত্তা কাব্যের জনক, সেই ব্যক্তি-সত্তা সহস্রশীর্ষ বাসুকীর মতো সহস্র অমৃত ভাণ্ডে মুখ ডুবিয়ে ভূমাস্পর্শী জীবনের রস পান করে। জীবনের কোনো একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার রস পান করে সে তৃপ্ত নয়।

তাই অখণ্ড ব্যক্তি-সত্তার পরিপুষ্টিতে নানা উপাদান নানান ধারা যেমন, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি—সব কিছুই রস জোগায়। —এও যেমন সত্য, এই সব বিচিত্র উপাদান-ধারা একটি ধারায় মিলিত হয়ে যে নিষ্কল ব্যক্তি-সত্তা সৃষ্টি করে সেই সম্পূর্ণতা থেকে সৃষ্টি আসে এটাও তেমনি সত্য। প্রতিটি আংশিক উপাদান থেকে সৃষ্টি আসে না। গোয়েটে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন, গোয়েটে বিজ্ঞানী ছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ ছিলেন, আরো কত কি ছিলেন, কিন্তু যে গোয়েটে 'ফাউষ্ট' লিখে-ছিলেন, তিনি না শুধু বিজ্ঞানী, না শুধু ইতিহাসজ্ঞ, নানাধারা মিশিয়ে যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একটি রূপ লাভ করেছিল সেই গোটা মানুষটি ছিল 'ফাউষ্টের' উৎস। কাব্য এই গোটা মানুষের সৃষ্টি। এই গোটা মানুষটির চিন্তা, জীবন-দর্শন, সব মিশে গিয়ে একটি প্রবল অনুভূতির ধারা সৃষ্টি করে, কাব্য সেই অনুভূতির ফল। তাই কাব্যকে বিশ্লেষণ করে কতোটা তার কল্পনা, কতোটা তার অর্থনীতি, দর্শন বা রাজনীতি এটা টুকরো টুকরো করে দেখানো সম্ভব নয়, আর যদি সম্ভবও বা হতো তাহলে কাব্যের রসাত্মক আত্মা সেই বিশ্লেষণের ধাক্কায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতো বলে সন্দেহ জাগে মনে। অনুভূতির বাইরে কাব্যের মধ্যে দার্শনিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সন্ধান করতে গেলে এই বিপদের আশঙ্কা জাগে মনে।

অনেক দিন আগে আচার্য যদুনাথ 'সোনার তরী' কবিতাটির একটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আচার্য যদুনাথের চেয়েও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমান

ইন্দ্রজিৎ। তিনি শুধু 'সোনার তরী' কবিতাটি নয়, সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের প্রতি কবিতার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

কবিতার মধ্যে যেটি ছবির অংশ, সেটির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে মুস্কিল ঘটে, রসের প্রতি অবিচার করা হয়। অথচ একটি কবিতার সবটাই ছবি নয়, তাতে মনন, অনুভূতি, সংস্কার—সব কিছু এসে মিশে একটি সম্পূর্ণতা সৃষ্টি করে, তবেই সে সার্থক সৃষ্টি হয়। সেই সম্পূর্ণ রসসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা চলে, কিন্তু সেখানেও দিঙনাগাচার্যের কথা স্মরণ রেখে সাবধানে এগোনা দরকার। ভরসার কথা, ও আনন্দের কথা এই যে, ইন্দ্রজিৎ রায় এ বিষয়ে খুবই সজাগ। তাঁর কথা দিয়েই বলি— "………রসসাহিত্য বুঝতে গেলে যদি সমালোচনার দৃষ্টি-প্রদীপের সাহায্য নিতে হয় তো, সেখানে রসসাহিত্যের রূপ অদৃশ্যই থেকে যায়।"

ইন্দ্রজিৎ রায় একটি নতুন মনস্বীতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি কবিতার বিশেষ রসটিকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি তার ভিতরের তত্ত্ব কথাটি বুঝবার ও বোঝাবার কাজে লেগেছেন। সব ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাও থাকতে পারে। মিল থাকলো বা না থাকলো তাতে উভয় পক্ষের কারো কিছু যায় আসে না, কিন্তু যেটির অভাব ঘটলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয় সেটি হচ্ছে সহ-অনুভূতির অভাব ও অকারণ বিরূপতা চিত্তের। ইন্দ্রজিৎ রায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র কবিতাগুলির বিশ্লেষণের কাজে হাত দিয়েছেন। আমরাও যেন এই আন্তরিক দুঃসাহসিকতাকে বিরূপতাশূন্য দরদী মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি।

—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে একাধিক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, উনিশ শতকের জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিত ডারউনের বিবর্তনবাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছে। যাঁরা এমত সমর্থন করেন, জানিনা তাঁদের মন্তব্য কতটা স্বীকার্য্য! আমার মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী আর বলাকা প্রভৃতি কবিতাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করে তাঁর বিশেষ কাব্য-দর্শনের পেছনে কাজ করছে দুইটি মতবাদ, একটি ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন আর দ্বিতীয়টি অঁরি বার্গসঁর ক্রিয়েটিভ ইভল্যুসন এবং এই দুই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্রণের ভেতর দিয়ে সোনার তরী ও বলাকার কবিতাবলী মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূল কথা হল ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের মূল কারণ, অঁরি বার্গসঁর ক্রিয়েটিভ ইভল্যুসনের মূল কথা হল সৃজনশীল মহাকালই হল সৃষ্টির ক্রমোন্নতি ধারার মূল কারণ।

এখানে দুই মতবাদের সংমিশ্রণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতরে আত্মপ্রকাশ করেছে। সোনার তরী ও বলাকা তার বিশেস প্রমাণ।

বর্তমান গ্রন্থে সোনার তরীর যে দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হল তা' ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও বার্গসঁর ক্রিয়েটিভ ইভল্যুসনের ওপর ভিত্তি করেই। অবশ্য এই দুই দর্শনের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও যেখানে এসে তারা মিলিত হয়েছে সেইখান থেকেই সুরু হয়েছে সোনার তরীর দার্শনিক ভিত্তিভূমি এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। আমার প্রচেষ্টা এখানে কতটা সার্থক হয়েছে বিজ্ঞ পাঠক তা' বিচার করবেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও বহু মূল্যবান মন্তব্যের জন্য পরিচালক নীরেন লাহিড়ীকে জানাই ধন্যবাদ। প্রচ্ছদপটের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী প্রণব বিশ্বাসকে এবং যাদের সাহচর্য ও সহযোগিতায় এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল তাঁরা হলেন 'দৃষ্টি কোণের' কবি অমল ঘোষ এবং আমার একান্ত স্নেহাস্পদ শ্রীসমর সেন। মুদ্রাকর অজিতবাবু যিনি এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যাপারে তাঁর নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইন্দ্রজিত।

ইন্দ্রলোক প্রকাশনীর আগামী গ্রন্থ :

ইন্দ্রজিত-এর :

১৭, ১৮, ১৯, ২০. সতেরো শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের মধ্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সুচিন্তিত ইতিহাস। দাম : বারো টাকা।

অমল ঘোষের :

প্রগতিধাম যুগোত্তর কাব্য সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ।
দাম : পাঁচ টাকা।

সোনার তরীর দিগ্‌দর্শন

বহুনিন্দ্রাণী সহস্রাণী
দেবানাঞ্চ যুগে যুগে
কালেন সমতিতানী
কালোহি বলবৎতরো।"

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা,
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা
ভরা নদী ক্ষুর ধারা খর পরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর কাব্যিক ব্যাখ্যা অনেক শোনা গেছে। কিন্তু, নিছক দার্শনিক ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এ পথে কেউ এগিয়েছেন কিনা জানা নেই। তাই সেই পথে এগিয়ে যাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া গেল। এখন কথা হল, যে, দার্শনিক তত্ত্বের উপর এর প্রতিষ্ঠা সেই তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত প্রতীকগুলোকে চিনে নেওয়ার যা এই কবিতার অন্দর মহলে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র। এখন প্রতীকগুলো কি দেখা যাক :—

ঘন বরষা অর্থে	—	অবস্থা
আমি	—	জীবসত্ত্বা
ধান	—	অবদান
ক্ষেত্র	—	মন বা কর্ষণভূমি
তরী	—	কাল

এখন উপরোক্ত প্রতীকগুলোকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে মোটামুটি সৃষ্টিতত্ত্বের একটা হদিস পাওয়া যায়। কালকে তাই মনে করে নেওয়া হচ্ছে প্রকৃতি সত্ত্বার জনক হিসাবে। আবার প্রকৃতি সত্ত্বাই হল জীবসত্ত্বার জননী। আর এই জীবসত্ত্বা থেকেই ঘটে অবদান বা বিশেষ সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ। জীব-সত্ত্বা মাত্রই ক্রিয়াশীল, প্রকৃতির গর্ভচ্যুত হয়ে সে চৈতন্যশীল জীব হিসাবে স্বাতন্ত্রলাভ করলেও সে কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে জীবসত্ত্বা হিসাবে মানুষকেই বলা হচ্ছে, এখন এই মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে কিছু না কিছু সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টির মধ্যে যা আবার বিশেষ সৃষ্টি বা অবদান হয়ে ফুটে ওঠে তাকেই দেখা যায় কালের শ্রেষ্ঠ ভোগ্যে রূপান্তরিত হয়ে যেতে।

প্রকৃতি সত্ত্বা, জীবসত্ত্বা ও তার অবদান সবই কালের সামগ্রী। মানুষের নিজের বলতে যদি কিছু না থাকে, যদি সব কিছু চিরদিন ধরে তাকে কালের হাতেই সমর্পণ করে যেতে হয় তাহলে অবদান সৃষ্টির প্রয়োজন কি? কারণ জীবসত্ত্বা অবদান সৃষ্টি করে কালের তাগিদে। কিন্তু, ভাবে এ তার নিজের জিনিস। সে বোঝে না যে, সে নিজেই যদি কালের হয়, তাহলে পৃথকভাবে অবদান বোলতে কি থাকতে পারে? মন কর্ষণে বা ভূমি কর্ষণে যে অবদান ফল হোয়ে পরিণতি নিল আসলে তার মূলেও রয়েছে সেই কালেরই প্রভাব। কারণ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কাল তার উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর তাই প্রকৃতি সত্ত্বা ও জীবসত্ত্বার মাধ্যমে সৃষ্টির নব নব রূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হলেও তারা নিমিত্ত মাত্র, কারণ অবদান গ্রহণের ব্যাপারে মাধ্যমের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই প্রকৃতি সত্ত্বা ও জীবসত্ত্বার আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। জীবসত্ত্বাকে তাই এখানে মাধ্যম হিসাবেই মূল্যবান বলে মনে করে নিতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে অবদানের অবসান আছে কি নেই! সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে।

"একখানি ছোটো ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা

পর পারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
এ পারেতে ছোটো ক্ষেত আমি একেলা”

মস্তিষ্ক কর্ষণে যে উপাদান বের হয়, জীবসত্ত্বা ভাবে অন্তুতঃ তার কাছে এর মূল্য আছে। এখানে আমিত্বের কথা এলো কেন? কারণ অবদানকে যদি অবদান বলে স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে, একে অবদান বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে কে? এর স্বীকৃতিও কালের কাছে।

আবার হঠাৎ জীবসত্ত্বা যখন দেখে কালের গতিছন্দে লাগছে প্রলয়ের বাতাস। দেখা যাচ্ছে অবদান সহজ গতিতে এগোতে পারছে না, তখন ভয় পাওয়ারই কথা। সে ভাবে আকাশের বাদলের আশীর্ব্বাদ কি সূচনা করছে কালান্তরের? যুগ কি পরিণতি নিচ্ছে যুগান্তরের? তখন কালের বিরাট ভয়ংকর সর্বগ্রাসী, পরিচয়-গ্রাসী রূপের দিকে তাকিয়ে সে আঁতকে উঠছে। প্রকৃতির কোলে বসে যখন সে ভাবছে তার অপমৃত্যুর পরিণামের কথা, তখন হঠাৎ সে দেখতে পেল,

“গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে,
ভরা পালে চলে যায় কোনোদিকে নাহি চায়
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু’ধারে।”

এ কে? যেন চেনা মনে হয়, গানের সুরে তার পরিচয় পালতোলা নৌকার ওপর। এ হল কাল, তরীটা কালেরই প্রতীক। জল যেমন বেগবান, কাল তার চেয়েও বেগবান। তরী কেউ বাইছে না, তরীর ভেতরে মাঝি নিজেই নিজের প্রতীক। কাল নিজেকেই তরী করে এখানে আবির্ভূত। গান তার

নিজের পরিচয়। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো। যে ছিল, তাকে পরে চিনতে পারা যায়।

কাল তার বাস্তব সত্তার প্রতিনিধি হিসাবে যে প্রতীকের সৃষ্টি করেছিল, তার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে, জীবসত্তা থাকে ফুটিয়ে তুলুক। এবং সেই ফুটিয়ে তোলার সফলতা যখন অবদান রূপে মূর্তি নেয় তখন কালই আবার তাকে হরণ করে। অর্থাৎ জীবসত্তা যে প্রতীকময় বারি বর্ষণে কর্ষণ ক্ষেত্রকে উর্বর করে উপাদানকে সৃষ্টি করেছিল সেই বর্ষণকে এখানে তীব্রতর করে করলো প্রলয়ের সূচনা। অর্থাৎ যে অবস্থায় অবদান তার রূপ নিতে সক্ষম হয়েছিল, সেই রূপের প্রকট অবস্থা বা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করলে অবদানের গতি তার নিজের সময়ের মধ্যেই লীন হয়ে যায়। কালের অবস্থার রূপান্তরে অবদান ব্যাপ্তিলাভ করতে পারে না, এখানে অবস্থার প্রয়োজন নিতান্তই দরকার, বর্ষণ এখানে তাই কল্পনা মাত্র।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে
বারেক ভিড়াও তরী কুলেতে এসে,
যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসী তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে,
আমার সোনার ধান কুলেতে এসে।"

জীবসত্তা যখন তার স্বাতন্ত্র লাভ করে, তখন সে বোঝে অবদানকে সৃষ্টি করে তার বৈশিষ্ট্য লাভ ঘটলেও সেটা নিজের ভেতরে রাখবার জন্যে নয়। মাতৃত্বের সক্রিয়তা ফুটে ওঠে সন্তানকে নিজের গর্ভে বহন করার সময় থেকে। সেই সংগে তার অন্তর্নিহিত শক্তি বার বার চেষ্টা করে, যে সন্তানকে সে গর্ভে বহন করছে তাকে বাইরের জগতের সামনে তুলে ধরবার জন্যই তাঁর মাতৃত্বের চরম স্বার্থকতা। তার অন্তর্শক্তির সক্রিয়তার পেছনে তিনটি শক্তির লীলা লক্ষণীয়। একটি হল, অবদান পরিপুষ্ট হলে অন্তর্শক্তির

কাজই তাকে বাইরে প্রকাশ করা, দ্বিতীয় হল, উপাদানটি যখন অবদানে পরিণত হয়েছে তখন সেও চায় তার আত্মমুক্তি। এবং এই বহিঃপ্রকাশের মূলে কাজ করছে যে দুটো শক্তি সে দুটোকেও ক্রিয়াশীল করছে তৃতীয় এক শক্তি, যে তিনটিরই নিয়ামক হল আবার কাল। কালের এই নিয়ন্ত্রণ শক্তিকেই বলা যেতে পারে সমস্ত ক্রিয়ার মূলশক্তি। কাল যখন দেখে জীব-সত্ত্বার ভিতরের উপাদানটি অবদানে রূপান্তরিত হয়েছে; তখন সেই অব-দানকে বহিঃপ্রকাশের প্রেরণা যোগায় আবার কালই। সৃষ্টির আদি থেকে অবদানের বহিঃপ্রকাশ পর্যন্ত চলে কালের বিরামহীন ক্রিয়াশীলতা।

উপাদান অবদান হয়ে প্রকাশিত হল। জীবসত্ত্বা ও তার অবদান বসলো পাশাপাশি, দিন চললো। এলো কাল, জীবসত্ত্বার কাছ থেকে অবদানকে নিয়ে যেতে। জীবসত্ত্বা কালকে চিনে ছিল, তাই বলে,—দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। কাল এলো যখন জীবসত্ত্বার কাছ থেকে অবদানকে গ্রহণ কোরতে, তখনও জীবসত্ত্বা বুঝতে পারেনি কালের আগমনের কারণ, তাই সে বোলল—

যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসী তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে

কালের চিরদিনের ক্ষণিক হাসিতে রয়েছে অপরিবর্ত্তনীয় রূপ। জীবসত্ত্বা মাত্রই সেটা চিনতে পেরেছে।

কাল তার তরী ভারী করলো অবদানের সম্ভারে।

আর আছে? কালের জিজ্ঞাসা।
প্রত্যুত্তর,—"আর নাই দিয়েছি ভরে"।
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়েছিনু তুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে॥

(জীবসত্তার প্রার্থনা—)

জীবসত্তার আক্ষেপ—

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে, ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা কিছু নিয়ে গেলো সোনার তরী।

কালের গ্রহণীয়, অবদান। জীবসত্তার মূল্য এখানে নেই। পাখী ডিম থেকে বাইরে আসলে সেদিন সে হয় পাখী তার এতদিনকার গর্ভাধারটি সেদিন অপাংক্তেয় হয়, হয় ডিমের খোলা হিসেবে।

অবদানকে যেদিন কাল গ্রহণ করে সেদিন জীবসত্তা মূল্যহীন হয়ে যায়।

জীবসত্তা যখন বুঝল যে অবদান ছাড়া তার মূল্য নেই—তখন সেও চায় অবদানের সঙ্গে যেতে, কিন্তু তার অবদানের সম্ভারে নৌকা যখন পূর্ণ ঘটের মতো, সেখানে তার নিজের জায়গা নেই।

জীবসত্তা থাকলো উপেক্ষিতের মতো। কারণ এর পরে সে মূল্যহীন।

"যাহা ছিলো নিয়ে গেলো সোনার তরী"

রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতায় বোঝাতে চেয়েছেন যে, অবদানের কাছে স্রষ্টার মূল্য কিছুই নেই কারণ কালের কোলে অবদানেরই স্থান আছে। স্রষ্টা সেখানে মূল্যহীন।

লোকে বলে অকাল, কিন্তু, কালের সময় মতোই কাল আসে, সেখানে হিসেবের অঙ্কে গোলমাল নেই। অবদানকে চিনতেও তার দেরী লাগে না।

সোনার তরী নামে কবিতাটির ভেতর সোনার তরীর কবিতাবলীর মূল সুরটি এখানে স্পষ্ট, কিন্তু এখানে মূল সুরের সঙ্গে শাখা প্রশাখাগুলো নেই বলে তার সামগ্রিক রূপটি হয়তো সহজ বোধ্য নয়।

এই শ্রেণীর কতকগুলো শ্রেষ্ঠ কবিতার ভেতরে সে রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এর মূল সুরটিকে ভুলে গেলে শাখা প্রশাখা-গুলোকেই অবলম্বন করতে হবে কিন্তু মূল সুরটির রস, শাখা প্রশাখা দিতে পারে না।

সোনার তরীর মূল কবিতায় যে দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া গিয়েছে, এই শ্রেণীর অন্য কবিতাবলীর ভেতর তা অতটা স্পষ্ট নেই। তা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর কবিতাবলীর ভেতরে যদি মূল সুরকে পেতে চেষ্টা করা যায়, তাহলে বঞ্চিত হওয়ার আশা কম।

সোনার তরীর সব কবিতা উধৃতির দরকার নেই, কারণ রস-সাহিত্যকে বুঝতে গেলে যদি সমালোচনার দৃষ্টি-প্রদীপের সাহায্য নিতে হয় তো, সেখানে রস-সাহিত্যের রূপ অদৃশ্যই থেকে যায়, যেটুকু উধৃতি করা হচ্ছে ও হবে সেগুলো নেহাত কবিতার মর্মার্থকে বোঝানোর জন্যে। নিদ্রিতা ও সুপ্তোত্থিতা কবিতার উধৃতির দরকার নেই, সংক্ষেপে তার মূল বক্তব্যটি আলোচনা করলে রসের অঙ্গহানি হবে না।

একটি রাজপুত্র একটি রাতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এক ঘুমের রাজ্যে। রাজা থেকে তার কন্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে—নিঃশব্দে রাজপুত্র প্রবেশ করলেন ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘরে। তার রূপ সম্ভার দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চোখের পাতায় চুম্বন করে ভূর্য্য-পাতায় কাজল দিয়ে নিজের নাম লিখে সোনার সুতোয় তার নিজের যে রত্নহারটি ছিল সেইটের সঙ্গে সেই পরিচয় পত্রটি গাঁথলেন, তার পর রেখে চলে গেলেন। ভূর্য্য পাতায় লেখাছিল নিদ্রা নিমগ্না, আমার প্রাণ আমি তোমাকে সমর্পণ করলাম। তারপর সেই মালাটি পরালেন রাজকন্যার গলায় নিদ্রিত কবিতাটির এইখানে শেষ। এর পর সুপ্তোত্থিতা কবিতার ভেতরে ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙ্গার পালা—

ঘুমের দেশের রাজ্য থেকে আরম্ভ কোরে সকলেই জেগে উঠলেন।

আর জাগলেন সেই রাজকন্যা। মালাটি নিয়ে বারবার করে দেখে মালার ভেতরে রাজপুত্রের অস্তিত্বকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন—নিজের অস্তিত্বের ভেতরে যেন বোধ করলেন রাজপুত্রের প্রেমের স্পর্শ। মাসের পর মাস কাটলো, এক বসন্তে যে কল্পনা আরম্ভ, নতুন বসন্তেও সে কল্পনা থামলোনা রাজকন্যা শুধু ভাবছিলেন কে তাঁকে মালা পরিয়ে গিয়েছে।

কে মালা পরিয়েছে ?

এবং কাকে ?

মালা এখানে কেউ নয়, রাজপুত্র রাজকন্যা সবই কাল্পনিক।

এখানে বোঝানো হোয়েছে যে কাল আসে জীবসত্ত্বার অবদানের কাছে অবদান আদায় করতে, জীবসত্ত্বা তাকে অনেক সময় চিনতে পারে না সে শুধু হরণই করে তা নয়, সে জীবসত্ত্বাকেও মূল্যও দিয়ে যায়। কিন্তু এমন মুহূর্ত্তও আসে, যে সময় পরস্পরের দেখা হয় না। কাল চিনতে পারে জীবসত্ত্বাকে কিন্তু তাকে চিন্‌তে কাল সময় দেয় না।

রাজপুত্র এখানে কাল, রাজকন্যা জীবসত্ত্বা, রাজকন্যার যৌবন—অবদান জীবসত্ত্বার অবদান রাজপুত্রের দেওয়া মালা, জীবসত্ত্বাকে সম্মানিত করার জন্যে কালের উপহার।

কাল এখানেও নিল অবদানকে, কিন্তু জীবসত্ত্বা পেল পুরস্কারের ভেতরে অবহেলা। কাল বোঝালো তোমার অবদানই আমার প্রাপ্য, তুমি নয়, তবে অবদানের ধারক হিসেবে তোমার পাওনা যদি থাকে তো তা থেকে আমি বঞ্চিত করবো না।

দুটি কবিতার ভেতর থেকে সোনার তরীর সুরটিকে স্পষ্ট বুঝতে না—পারলেও বুঝে নেওয়া যায়।

" হিং টিং ছট্ "

কবিতাটির ভেতরে মূল সুর পাওয়া গেল শেষের দিকে। কাব্য কাহিনী এখানে

তীব্রভাবে উপহাস করেছে ভাববাদীতার দর্শনশাস্ত্রকে, যে দর্শন সত্যকে বোঝাতে গিয়ে স্থূল বস্তুকে স্বপ্ন ভাবে, সেখানে সে মিথ্যার টীকাকার মাত্র।

বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করার পেছনে আত্ম তৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু তাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কবি তাই দেশাত্মক সুরে বলেছেন—

বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে।
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
একথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরল ভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই তোলো হাই শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে একথা নিশ্চিত।
জগতে সকলই মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

এরপর "পরশ পাথর"[১২] কবিতায় আসা যাক্—

সঙ্গীতের ভেতরে প্রকাশিত হচ্ছে সৃষ্টি রহস্যের প্রাণের স্পন্দন, সে প্রাণ সেদিনও জলের ভেতরে সুপ্ত ছিলো। তারপর সমুদ্র মন্থন করলেন দেব আর দানবে। সেই সমর্থনে উঠলেন লক্ষ্মী যিনি ছিলেন অমৃতের প্রতীক।

কোথায় সে অমৃত যার স্পর্শে সব কিছুই অমরত্ব লাভ করে? তাই তার সন্ধানে—

"সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণ দেহে জীর্ণ চীরে
খ্যাপা খুজে খুজে ফিরে পরশ পাথর॥"

একদিন গ্রামের একটি ছেলে খ্যাপাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কোমরে সোনার শেকলটি তুমি কোথায় পেলে? চমকে উঠলো খ্যাপা, দেখলো সত্যিই

সোনার শেকলই বটে ! ছিল লোহার শেকল সেই লোহা হয়েছে সোনায় পরিণত বারবার সে দেখলো বুঝলো এ স্বপ্ন নয়, সত্যিই। এর পর তার আত্ম-বিলাপ হলো আরম্ভ। বারবার সে মাথা চাপড়াচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে। আবার খুঁজতে আরম্ভ করলো তার স্পর্শমনিকে।

"পাগলের মতো চায় কোথা গেলো, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পালাইল সফল বাঞ্ছনা
কেবল অভ্যাস মত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের 'পর—
চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ পাথর"

এর পর আবার সে উগ্যম করে খুঁজতে আরম্ভ করলে বটে, কিন্তু তখন তার আর স্বাস্থ্য নেই, উগ্যম হয়েছে ম্লান।

পরশ পাথর কবিতাটির ভেতরে বুঝতে পারা গিয়েছে যে, জীবসত্তা যদি কালকে খুঁজে বেড়ায়, তাহলে তার ঐকান্তিকতার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে যে কাল ধরা দেবে এ ধারণা ভ্রান্ত। কালের ঠিক মনে থাকে কখন কার।

এখানে জীবসত্তার প্রতীক খ্যাপা, স্পর্শমনি কাল। সুপ্তোত্থিতা রাজকুমারী কালের কাছে যে মালা পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে সোনার শেকল অতুলনীয় অবদান। এ কবিতায় বুঝতে পারা গিয়েছে যে—জীবসত্তার সঙ্গে কালের চোখে চোখে দেখা যে হবেই তেমন কোনও কথা নেই। কাল থেকেই—অবদানকে আর প্রয়োজন বোধে সে অবদানকে পুরস্কৃতও করবে। এখানে করুণাভিক্ষার কোনও অর্থ নেই কালের বিবেচনা কল্পনা মাত্র, কারণ ক্রিয়াশীল কালের যে কোন কাজ শুধু কাজই, করুণা ও বিবেচনা তার থাক বা না থাক ছন্দে তার ভুল নেই।

খ্যাপা বুঝতে পেরেছিল যে স্পর্শমনির এমন একটা ক্ষমতা আছে যার ছোঁয়াতে অবদান হয়ে ওঠে সোনা। খ্যাপা তাই স্পর্শমনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, ওটি তার নিতান্ত দরকার, ওটির অধিকারী হোতে পারলে—মানুষ চরম আনন্দ পেতে পারে, সোনা, সোনা, সব সোনা, শুধু স্পর্শ করাতে পারলে হয়, এই ভেবে পাথরের নুড়িগুলোকে কুড়িয়ে সে তার লোহার বন্ধনীতে ছোঁয়াচ্ছিল আর ফেলে দিচ্ছিল। এইভাবে চলেছিলো অনেকদিন।

খ্যাপা জানতো না যে তার চাহিদা কি? আর স্পর্শমনির ছোঁয়ায় সব সোনা হলে সে ঐশ্বর্য্য সে সহ্য করতে পারবে কি না। সে পাগল—আত্মবিস্মৃত। সে জানেনা তার চাহিদা কতটুকু। হঠাৎ গ্রামের ছেলের কথায় সে চমকে উঠে দেখলো তার লোহার বন্ধনী সোনায় পরিণত হয়েছে। সে জানতো না যে ওইটুকুই তার প্রাপ্য।

এখানে আর একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসি সেটা হলো যে, অবদান বুঝে কালের কাছে জীবসত্তার পুরস্কার লাভ হয়, সব সময় নয়।

কারণ প্রথমের দিকে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীবমাত্রই ক্রিয়াশীল। সুতরাং ক্রিয়ার একটা অবদান আছে, কোনও কোনও জীবসত্তা জানতে পারে তার অবদানকে। কিন্তু এই যে প্রতিটি জীব তার নিত্য নিয়ত জীবন-পথে কিছু না কিছু সৃষ্টি করে চলেছে, তার মূল্য অন্যের কাছে না থাকলেও কালের কাছে আছে, তাই তার পুরস্কার কাল দিয়ে যায়। জীবসত্তা তাতে সন্তুষ্ট হলো কি না হলো তাতে দরকার নেই। কাল জানে কার কতটুকু প্রাপ্য সেই প্রাপ্তিতে কেউ দুঃখ পেলো কি আনন্দ পেলো তাতে তার কিছু আসে যায় না।

খ্যাপা খুঁজে বেড়াচ্ছিল স্পর্শমনিকে এই খ্যাপা এখানে সাধারণের চোখে ক্রিয়াশীল জীব মাত্র। তার চাহিদার অতিরিক্ত চাইতে সে লজ্জা বোধ করে না। কিন্তু কাল তাকে বেশীও দেবে না কমও দেবে না। দেবে তার যতটুকু পাওনা। খ্যাপা তাই পেলো সোনার বন্ধনী, কাল পালালো খ্যাপার জ্ঞানের অগোচরে।

পরশ পাথর কবিতাটিতে নিদ্রিতা ও সুপ্তোত্থিতা কবিতা দুটির ছায়া পাওয়া

যায়. যেখানে রাজপুত্র এসে রাজকন্যার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেল ওখানে যদি রাজকন্যাকে একজন ক্রিয়াশীল জীব বলি তা হলে খ্যাপার সঙ্গে তার মিল আছে। নিদ্রিতা ও সুপ্তোত্থিতায় কবিতার আলোচনায় কালের সমালোচনা ও তার স্বভাব আলোচনা এই ভাবেই করা হয়েছে।

কিন্তু সেখানে জীবসত্বার অবদানটাই একদিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিটি জীবের ক্রিয়াশীলতার মূল্য যে কালের কাছে প্রাপ্য থাকে এ কবিতা দুটিতে সে সুর স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি, যেমন উঠেছে পরশ পাথর।

কিন্তু সোনার তরীর মূল সুরটি এখানে এবং ওখানে দুই জায়গাতেই ফুটে উঠেছে।

কালের সঙ্গে ক্রিয়াশীল জীবন এবং তার অবদান এর সম্পর্ক সোনার তরী কবিতাবলীর ভেতরে বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে, কোথাও স্পষ্ট কোথাও দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ কোথাও মূল সুর অস্পষ্ট কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়নি। কোথাও মূল সুর চাপা পড়েছে আবার ঘটনা ও বর্ণাঢ্যতার বাহুল্যে আবার কোথাও তার স্পষ্ট রূপ।

'দুই পাখী' কবিতাটির ভেতরে কাল ও জীবসত্বার আত্মিক বন্ধনটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামান্য দুটো পাখীকে প্রতীকময় করে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বনের পাখী কাল, খাঁচার পাখী জীবসত্বা—খাঁচা প্রকৃতিসত্বা, কালের সঙ্গে জীবসত্বার অনেক প্রভেদ তবু আত্মিক সম্পর্ক তারা পরস্পরের কাছাকাছি। নিরবিচ্ছিন্ন কালের প্রতীক বনের পাখী চাইছে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবসত্বাকে নিজের কাছে আনতে কিন্তু এখানে প্রধান বাধা হ'ল খাঁচা, প্রকৃতির সত্বার প্রতীক। অসীমতা আকর্ষণ করছে জীবসত্বাকে। কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

এই বাস্তব বাধাটি এ ক্ষেত্রে প্রবল করে দেখিয়েও আত্মিক মিলনের বাধা সেখানে নেই।

কবির কথার মর্মার্থ করতে গেলে বলতে হয় যে কাল ও জীবসত্তার আত্মিক যোগাযোগ থাকলেও কেউ কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না। যদিও জীবসত্তা কালের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, কিন্তু খাঁচার আবেষ্টনীর ভেতরে যার জীবনের আরম্ভ, সে ভরসা পায় না অসীম শূন্যতায়। তার চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে বস্তুকে নির্ভর করে, সীমাহীনতার বুকে নিজেকে সমর্পণ করার ইচ্ছে থাকলেও ভরসা নেই।

আর কালের প্রতীক বনের পাখী চিন্তা করতে পারে না সীমাবদ্ধ জীবনকে কারণ তার পথ চলার পাথেও যে গতি, সীমার ভেতরে তা ব্যহত হয়। তাই পরস্পরের দুঃখ পরস্পর বোঝে, পরস্পরের আত্ম সুখও বোঝে, দুজনে এক হতে পারবে না তাও বোঝে, তা সত্ত্বেও তাদের আত্মিক মিল রয়েছে, যা থাকতে বাধ্য, কারণ কালের সঙ্গে জীবসত্তার চিরদিনের পরিচয়, এখানে অবদানের উল্লেখ নেই। কালের সঙ্গে জীবসত্তার যে নিত্য পরিচয়, সেই পরিচয়ের রূপই এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, প্রকৃতিসত্তার বাধা এখানে অত্যন্ত প্রবল। তাই মিল হয়েছে কিন্তু মিলন হয়নি।

এবার—

"দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর।"

সামান্য ঘরোয়া পরিবেশের ভেতর দিয়ে সোনার তরীর রূপটি এমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। "যেতে নাহি দিব" দীর্ঘ কবিতাটি পড়লে।

পুজোর ছুটির পরে গৃহকর্তা ফিরছেন তার কর্মক্ষেত্রে। এই ছুটির কয়টি দিন তিনি দেশে কাটিয়েছেন। বিদায়ের সময় গৃহিনী নানা জিনিষ দিয়েছেন।

সাহায্যকারীরা বিছানা বাক্স বাঁধতে আরম্ভ করেছেন, বিদায়ের সময় এলো, স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে কর্তা গাড়ীতে উঠতে যাবার জন্যে এগিয়েছেন, দেখেন বাইরে দরজার কাছে তার চার বছরের মেয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে—

"মাগো আমি" সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়"

কিন্তু মেয়ের বাঁধন বাবাকে ধরে রাখতে পারলো না—

"তবুও সময় হলে শেষ তবু হায়
যেতে দিতে হল"

কালের হাতছানির কাছে প্রকৃতিসত্ত্বার বাধাও হার মানে।

প্রকৃতি চায় জীবসত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে, কি-ও সেই প্রকৃতিসত্ত্বার ভেতরেও কাল তার কাজ করে যাচ্ছে।

আজ যাকে আঁকড়ে রাখবে, কাল সেও চলে যাবে, গতকাল যে ছিল না, সে তখন জীবসত্ত্বায় পরিণত হয়েছে এবং যে নিয়মে সে এসেছে সেই নিয়মেই সে চলে যাবে কারণ গতিই জীবনের ধর্ম।

দুই পাখীর দুটো পাখী পৃথিবীর বন্ধনে মিলিত হতে পারেনি, কিন্তু কালের প্রবল আকর্ষণ শুধু খাঁচা কেন দেহ মুক্ত করে দেবে খাঁচার পাখীকে, সেখানে বন্ধন মুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। সেদিন খাঁচাও চলবে পাখীও চলবে। খাঁচা ও খাঁচার পাখীর অস্তিত্বটি এখানে ক্ষণস্থায়ী। যেতে নাহি দিব কবিতাটির ভেতর তাই প্রকৃতিসত্ত্বাকে সম্বোধন করেই কবি লিখেছেন—

"ওরে মোর মূঢ় মেয়ে
কেরে তুই কোথা হতে কী শক্তি পেয়ে।
কহিলি এমন কথা স্পর্ধা ভরে
যেতে আমি দিব না তোমায়। চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোট হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বার প্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।"

কবির দৃষ্টি এখানে আরও সূক্ষ্ম. তাই তিনি সমস্ত প্রকৃতিসত্তার গতিময় জীবনকে উপলব্ধি করতে পারছেন। এখানে যদিও তিনি প্রকৃতিজাত। কিন্তু প্রকৃতির থেকে নিজেকে আলাদা করে তিনি দেখছেন কালের প্রভাবে চলমান প্রকৃতিকে। এখানে স্থিতিটাও চলমান কালের প্রভাব মুক্ত নয়।

সোনার তরীর কবিতাগুলোকে ধারাবাহিক সাজালে বুঝতে পারা যায় যে, কবির কাব্য রসের ভেতরে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব কেমনভাবে মিশেছে।

সোনার তরীর মূল সুর এ পর্যন্ত কোথাও ব্যাহত হয় নি। নানান দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবসত্তার অবদান, আর কালের পারস্পারিক সম্পর্কটিকে কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এবার সোনার তরীর মূল সুরটি বাজবে অন্য ভাবে,

এবার

"আজ কোনো কাজ নয়"। অর্থাৎ মানস সুন্দরী।

"যেতে নাহি দিব" কবিতাটির ভেতরে কবি দেখিয়েছেন কালের বেগময় সত্তার প্রভাবে সমস্ত চরাচর চিরকাল ধরে চলেছে। ওই কবিতাটির ভেতর কাল সমস্ত বস্তু জগতকে নিয়ন্ত্রিত করলেও, রূপটাকে বড়-করে দেখানো হয় নি।

প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার ভেতরেই তাকে স্পর্শ করতে পারা গিয়েছে তাই সে কবিতাতে কালকে সম্বোধন করে কোনও কথা নেই।

মানস সুন্দরীর ভেতরে আমরা কালকে দেখতে পেলাম নারীত্বের বিভিন্ন রূপে, প্রকৃতিসত্ত্বার সঙ্গে তার নিত্য মিলনটি তাই সেখানে রস মাধুর্য্যে সার্থক।

চিরদিন ধরে জীবসত্ত্বার কাছে কালের নিত্য দেখা নূতন নূতন রূপে। কবি বলেছেন জীবনের যে সীমিত জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আমরা বিচার করি যে অবদানকে গ্রহণ করার জন্যে কাল আসেন সময় সময়, সে চিন্তাটি ভুল, কালের সঙ্গে প্রকৃতিসত্ত্বা ও জীবসত্ত্বার কোন দিনই বিচ্ছেদ নেই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কাল তার অর্ঘ নিচ্ছে।

মানস সুন্দরী এখানে কাল, আর প্রকৃতিসত্ত্বা কবি নিজে। এখানে কালের নারী রূপ।

প্রকৃতির বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। নিজের ওপর দিয়েই যে উপলব্ধি তিনি করতে পেরেছেন, তার রূপ হলো কৈশোরে দেখা তোমাকে আর যৌবনে দেখা সেই তোমাকে, দুটোর মিল আছে বলেই মিলন হয়েছে, কিন্তু রূপ এক নয়, কৈশোরের পর যৌবন, তারপর সে যৌবনের প্রতিষ্ঠা।

“তারপর একদিন কী জানি সে কবে,
জীবনের বনে যৌবন বসন্ত যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিঃশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—বিশ্ব ক্ষেত্র হতে

কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছে অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছে মহিষীর মত। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া! পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি! ভরিয়া অঞ্চল—
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে!"

পরিবর্তনশীল কালকে মানস সুন্দরী রূপে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ কবিতাটির সঙ্গে "যেতে নাহি দিব" কবিতাটির অন্তরের রূপটি ধরা পড়ে। —'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির ভেতরে কবি বলেছেন—

"তবুও সময় হলে শেষ. তবু হায়
যেতে দিতে হল।"

সেখানে কালের গতিময় রূপটি ফুটে উঠেছে ভাব দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে।

কিন্তু যাওয়ার আগে একটা আশা আছে, সেই আশাটা সেখানে বড় নয়—'যেতে নাহি দিব' কবিতায় যেমন যাওয়াটাই প্রধান, মানস সুন্দরী কবিতায় তেমনি আসাটাও প্রধান, দুটো সামঞ্জস্য করে পড়লে সোনার তরীর সুরটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।)

দুর্বোধ্য কবিতাটির ভেতরে মানস সুন্দরীর সুন্দর রূপটি আবার দেখা গেল, যেখানে তিনি কালকে ভালোবেসে তাঁর অন্তরের অব্যক্ত প্রেমকে ব্যক্ত করেছেন। এখানে কালের সুন্দরী রূপের সামনে কবিতার অর্ঘ দেবার জন্যে তিনি অপেক্ষমান।

এখানে কালের কোনও উক্তি নেই কারণ সোনার তরীতে কাল চিরদিনই নিরুত্তর তার রূপ প্রকৃতিসত্ত্বার ভেতরে, তার জীবনের স্পন্দন তার গতিতে। কিন্তু তার নিজের ভাষা নেই প্রকৃতির ভেতর দিয়েই যে শব্দ পাওয়া যায় সেই শব্দের ভেতর দিয়ে কাল কথা বলে। 'সোনার তরী' 'পরশ পাথর' কবিতা দুটি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই দুর্বোধ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অবদান, আর কাল প্রাকৃতিক রূপে সজ্জিত। জীবসত্ত্বা ভাবছে কাল বুঝি অবদানকে বুঝতে পারছে না। কিন্তু কাল বোঝে সব, না হলে সে গ্রাহক হয় কেমন করে? কিন্তু তার মতামত নেই। কবি তাই এখানে ছলনা করে, অভিমানের অভিনয় করে—বলেছেন।

"নাইবা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে নতুন নতুন লোকে
পাঠ করো রাত্রি দিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধ খানা মন্
সমস্ত কে বুঝেছে কথন॥"

এবার—

পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা
নিশীথ বেলা
সঘন বরিষা গগণ আঁধার,
হের বারি ধারে কাঁদে চারিধার—
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা,
বাহির হয়েছে স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা
রাত্রি বেলা।

এখানে কবি, প্রাণ। কালের রূপ, ভাষা, জীবসত্ত্বাও কবি নিজে। নিজের প্রাণের ভেতরেও তিনি কালের অনুভূতিকে স্পর্শ করেছেন এবং নিজের কাছ থেকে প্রাণকে আলাদা করে যে বৈশিষ্টটি অবশিষ্ট আছে, তাই দিয়ে নিজের প্রাণকে তিনি জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন কালের স্বরূপ বলে, প্রকৃতির গর্জনের ভেতরে যে কালের প্রতিধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন, সেই ধ্বনিই তিনি শুনেছেন নিজের হৃদয় স্পন্দনের ভেতরে, তাই বহির্জগতে আর অন্তর্জগতে সেদিন তাঁর এক হয়ে গিয়েছে। কালের সেই অনুভূতি, সেই পদধ্বনিকে শুনতে গেলে তার নিজেকে নিজের থেকে আলাদা না করলে অনুভূতিকে উপলব্ধি করা যায় না। এ অনুভূতির রূপ তাই।

"আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া
নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে হৃদয় নাচে
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।"

এতদিন কবি, তার প্রাণটিকে নিজের সত্ত্বা বলে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে-ছিলেন। সে প্রাণকে তিনি প্রেয়সীর মতই ভালবেসেছেন। কিন্তু, যখন বুঝতে পারলেন যে, তার অন্তর্জগতের সত্ত্বাটুকুও কালেরই অঙ্গ তখন তাকে তিনি ধরতে চাইলেন নিজেকে আলাদা করে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, মানস সুন্দরী কবিতাটিতে তিনি প্রাকৃতিক জগতের ভেতরে কালকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিন্তু, সেই প্রাকৃতিক জগত ছাড়া আর অন্তর্জগতে যে একই সুরে বেজে চলেছে, যেখানে দুটো জগতের

ভেতরে বাঁধা মাত্র দেহ পিঞ্জরটি, এইটে বুঝতে পেরে তিনি নিজের ভেতরেই যখন উপলব্ধি করলেন সেই কালকে, তখন বুঝলেন যে মনের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করতে পারলে বিশ্ব সংসারে যাকে খুঁজে বেড়ান হচ্ছে তাকে সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু, জীবসত্তার সাতন্ত্র দিয়েই তাকে পেতে হবে, কারণ রসকে উপলব্ধি করার ভেতরে বস্তুর যে আনন্দ থাকে, সে যদি রসের ভেতরেই লীন হয়ে যায়, তাহলে আস্বাদনের আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না। এখানে,

"আমার মনের মানুষ যে"

এই বাউল গানটির অতুলনীয়—

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের রাধাও করে শ্রীকৃষ্ণের তাঁর নিজের রস মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্যে প্রকৃতিসত্তা হয়ে ছিলেন সেখানে রাধাকৃষ্ণ অদ্বৈত দেহ বিভক্ত হলো দুই সত্তায়, কৃষ্ণ হলেন রস মাধুর্য্যের অধিকারী আর রাধা হলেন আস্বাদনের অধিকারিণী। অধিকারী আর আস্বাদনকারিণী দুটো পৃথক সত্তা না হলে রস মাধুর্য্যের মূল্য বোঝা যায় না। রামপ্রসাদ তাই বলেছেন—

"চিনি হতে চাইনে মা
চিনি খেতে ভালবাসি"

সোনার তরীতে তাই সেই সুরই বেজে উঠেছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে, কিন্তু এখানে গত যুগের সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এখানে আছে সেই রসের বিশ্লেষণ নতুন দৃষ্টিতে। প্রাচীন রস সাহিত্য ধারার ইতিহাসে সোনার তরীর নজীর মিলতে পারে কিন্তু, বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকৃতি পুরুষের সম্পর্কটি দেখানো হয়নি, এবং এই দেখানোর ভেতরে কালের যে অনাবিষ্কৃত রূপটি ফুটে উঠেছে সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মৌলিকতা।

"সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটির ভেতরে কবিত্বের একটি আবিষ্কৃত সত্যকে তুলে দেখানো হয়েছে, সে কবিতার ভেতরে কাল সমুদ্র— পৃথিবী জীবসত্তার প্রতীক ও অবদান দুই। অনন্ত কালের সঙ্গে প্রকৃতিসত্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কবিতায় বিশেষ মূল্যবান কয়টি ছত্র সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছে।

"আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যাথা ভরে বাজে
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ সুদূর তরে
উঠেছে মর্মর স্বর। মানব হৃদয় সিন্ধু তলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারী
আকার প্রকার হীন তৃপ্তি হীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।"

এখানে বিশেষ লক্ষনীয় হলো এই ছত্রটি

"প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা"

"ঝুলন" কবিতায় যাকে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তার রূপ প্রকৃতি, কিন্তু তা কালের রূপ। প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা। এবার সেই "মানস সুন্দরী", কালকে কবি ডাকছেন পৃথিবীর কিনারায় দাঁড়িয়ে।

"নিদ্রিতা" সুপ্তোত্থিতা যেতে নাহি দিব মানস সুন্দরী, দুর্বোধ ঝুলন সমুদ্রের প্রতি কবিতাগুলোতে, কবি, কালের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন

করেছেন। কোনও কোনও কবিতায় কালের ভয়ঙ্কর রূপটিকে তিনি বর্ষার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ বর্ষা বার্ষিক নয়। এক দিক দিয়ে প্রলয়ের সঙ্কেত সূচক। এর প্রমাণ আমরা সোনার তরী কবিতাটির ভেতরেই পেয়েছি। তার পর থেকে যদিও মাঝে মাঝে সে সুর শোনা গিয়েছে, কিন্তু পূর্বের উদ্ধৃত কবিতা-গুলোর ভেতরে, আভাস পাওয়া গিয়েছে কালের সঙ্গে জীবসত্তা ও অবদানের একটা দেহাত্ম মিলনের প্রচেষ্টা রয়েছে। এবং সেটাকে অস্বীকার করার বৃথা চেষ্টা তিনি করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছেন প্রকৃতিসত্তার সঙ্গে গতিময় কালের পারস্পরিক সম্পর্ক। তিনি বুঝেছেন জীবসত্তা ও তার অবদান সবই যাবে কালের সঙ্গে এবং কালের বুকেই তার স্থিতি। সুতরাং বাস্তব জগতকে বড করে দেখেও তিনি কালকে অস্বীকার করেন নি।

সোনার তরী কবিতায় যেখানে তিনি আবেদন করেছেন—

"এখন আমারে লহ করুণা করে।"

তারপর আক্ষেপ করে বলেছেন,

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

উক্ত কবিতায়, কালের সঙ্গে অবদানেরই মাত্র সম্পর্ক, সেখানে জীবসত্তার কোনও দাম নেই। এই হতাশার সুর বার বার ধ্বনিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—

"শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"

নিদ্রিতা থেকে সমুদ্রের প্রতি পর্য্যন্ত, কালের সঙ্গে প্রকৃতিসত্ত্বা ও অবদানের চলেছে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, যেতে নাহি দিব কবিতায় উদাসী দার্শনিকের সুর বাজলেও সেখানে নেই।

'হৃদয় যমুনা' কবিতাটির ভেতরে তিনি কালকে সেই পরিচিত ডাকে ডেকেছেন।

ওই যে শবদ চিনি—নূপুর রিনিকি-ঝিনি,
কেগো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর
হৃদয় নীরে—

তুলনা করা যেতে পারে সোনার তরীর প্রথম কবিতাটির সঙ্গে

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে",

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটির ভেতরে কালের অবসম্ভাবী প্রভাব ও প্রকৃতিসত্ত্বার প্রতি জীবসত্ত্বার নিবিড় প্রেমটি যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া যাবে শেষার্ধের 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির ভেতরে এবং প্রতীক্ষার আলোচনায় ব্যর্থ যৌবনের আলোচনাটি বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে বলে এখানে চেষ্টা করা হয়েছে। আর হৃদয় যমুনার কেগো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে দুটি কবিতা বহন করেছে ওই একই অর্থ কিন্তু, সোনার তরী কবিতায় যেখানে তিনি দয়া প্রার্থনা চেয়েছেন হৃদয় যমুনার কবিতার তিনি সেখানে প্রেম কামনা করেছেন। এখানে মূল সুরটি একই, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীটা আলাদা।

এবার, গান ভঙ্গ কবিতাটির ভেতরে মূল সুরটি অবিকৃত থেকেছে বটে, কিন্তু আবার এখানেও সেই উদাসী দার্শনিকের সুর, কিন্তু ঠিক উদাসী দার্শনিক বললে

ভুল হবে এখানে কালের অপরাজেয় ক্ষমতার কাছে জীবসত্ত্বা ও অবদান সকলেরই শক্তি ক্ষীণ তাই :—

যুবক গায়ক কাশীনাথের গানের সুরে যখন সভার সব লোক বাহবা দিচ্ছে, তখন রাজা প্রতাপ রায় বসে আছেন স্থির হয়ে। কাশীনাথের নাম তার ভালো জানা ছিল না, ব্রজলালের গান (বরজ লাল) ছাড়া আর কারুর নাম তার ভালো লাগে না, রাজা প্রতাপ রায় ও ব্রজলাল দুজনেই বৃদ্ধ, কিন্তু কাশীনাথ আর সভার অন্য সব শ্রোতারা তরুণ। কিছুক্ষণ পরে কাশীনাথ থামলো বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে, রাজা কেদার রায় ব্রজলালের কানের কাছে গিয়ে বললেন ওস্তাদ, তুমিও গানের মত একটা গান শুনিয়ে দাওতো, ওটা কি'গান হল। বৃদ্ধ ব্রজলাল তখন ধীরে ধীরে গান গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বার্ধক্যের জন্যে ভালভাবে গাইতে পারলেন না তিনি, একবার গানের ছত্র ভুলে যান, তাকে মনে করতে গিয়ে, সব গোলমাল হয়ে যায়, আর তিনি পারেন না। হাত তাঁর তানপুরার ওপরে কাঁপতে থাকে।

নতুন যুগের শ্রোতার দল ব্রজলালের গানকে প্রশংসা করতে পারলেন না। অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন, আসর যেন হয়ে উঠলো চঞ্চল। বারবার চেষ্টা করেও যখন ব্রজলাল পারলেন না, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। নিজের ধিকৃত মাথাটাকে রাখলেন তানপুরার ওপরে। প্রতাপ রায় ব্যথিত হয়ে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। প্রতাপরায় ব্রজলালকে বললেন, এস আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই বলে দীপোজ্জ্বল সভা থেকে দুই বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন।

রাজা প্রতাপ রায়কে ব্রজলাল দুই হাত যোড় করে মিনতি জানালেন যে আমাদের সভা আজ ভঙ্গ হয়েছে, এখন নতুন লোকের সভা, অতএব চলুন আমরা,

আমরা নিভৃত সভায় যাই সেখানে আপনি আর আমিই শুধু থাকব, সেখানে নতুন জগতের লোককে আনবেন না।

"একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আর একজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে তো কলতান উঠে,
বাতাসে মর্মরি শিহরি কাঁপে তবে তো মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।"

এখানে উদাসী দার্শনিকের সুরটি স্বচ্ছ, কিন্তু সেখানে সোনার তরীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটিও অম্লান। এখানে তার রূপটি একটু স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

উদাসী দার্শনিকের হিসেবে গতিশীল কালের কাছে বিগত দিনের অবদানের দাম নেই, তাই যেমন করে একদিন অনাগত বর্তমানে পরিণত হয়েছিল, তেমনি সে তাকে আবার অতীতের কোলে যেতে হবে সেদিন। বর্ত্তমানের শূন্য কোঠায় ভাবি কাল নেবে বর্ত্তমানের শূন্য আসন। প্রকৃতিসত্তার ওপরে কালের এই প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু তার পরই কবি বলেছেন—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে তো কলতান উঠে, বাতাসে বন সভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে। এই বিশেষ দুই ছত্রে কবি, কাল প্রকৃতিসত্তা আর অবদানের একটা পারস্পরিক সম্বন্ধকে বার করতে চেষ্টা করেছেন।

কবি জনোচিত চিত্তবৃত্তি খোঁজে প্রতিটি সত্তার ভেতরে একটি ঐক্যতান, দুটি বা একাধিক বিরুদ্ধসত্তার ভেতরে সে খুজে বেড়ায় মিলনের সুর। কারণ কাব্য সার্থক হয় মিলনে, আবার সে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় বিরহের ভেতরে। তাই কবি মানস বিচ্ছেদের ভেতরে অতীতের মিলনকে খুজতে ভালবাসে। ভাব জগতের কাব্য দর্শন চায়না মিলনের স্থায়ী রূপ চায়না, সে রকম বিরহ যার ভেতরে মিলনের স্থিতি আছে। তাই মিলনাত্মক বিরহান্তের কাব্যই ভাববাদী কাব্যের মূল দর্শন।

এক্ষেত্রে সে দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব নেই। কবি দেখেছেন এই বিরাট বিশ্বে যে গতিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, সে গতি আসলে পরিবর্ত্তন ধর্মী কালের ইঙ্গিতে প্রকৃতিসত্তা যেমন তার রূপ পরিবর্ত্তন করে নিজেকে কালের সামনে ধরে দিচ্ছে, কালও তেমনি প্রকৃতির বেশে এসে তাকে গ্রহণ করছে, বিশ্ব জুড়ে চলছে এই বিরামহীন চিরন্তন দেওয়া নেওয়ার খেলা। এখানে দুটোরই প্রয়োজনকেই কবি দেখাচ্ছেন, এক প্রকৃতিসত্তা আর তার অবদান। এ দুটো না থাকলে কালের শক্তিকে বোঝা যায় না, আবার কাল না থাকলে স্বকীয়তার মূল্যও তেমনি বোঝা যায় না।

এই দুইটি পৃথক সত্তাকে চলতে হয় পরস্পরের ওপরে নির্ভর করে।

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে
বাতাসে বন সভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে॥"

কাল এখানে জল আর বাতাস,
প্রকৃতিসত্তা এখানে তট আর বন।

'ঝুলন' আর 'গান ভঙ্গ' কবিতা দুটির ভেতরে, কবি, কাল প্রকৃতিসত্তা ও জীবসত্তার ভেতরে নিগূঢ় সম্পর্কটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"লজ্জা" কবিতায় কবি প্রকৃতির স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমরা যদিও জানি যে, কালের প্রভাবেই প্রকৃতিসত্তা, জীবসত্তা ও অবদানের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে জীবসত্তা ও তার অবদানের স্রষ্টা প্রকৃতিসত্তা নিজে, এক্ষেত্রে কাল তাই গ্রাহক মাত্র। কালকে দেখে প্রকৃতিসত্তা নিজেকে ভাবছেন রিক্তা, তাই তার লজ্জা।

"শুন বধু, শুন তবে সকলই তোমার হবে
কেবল সরম থাক আমারি।"

সম্পর্ক যেখানে নিবিড়, সেখানে প্রকৃতিসত্তার এ লজ্জাও শোভা পায়।

সকলই তোমার হবে—অর্থে

আমি এবং আমার অবদান সবই তোমার কিন্তু, এই ক্ষণস্থায়ী সাতন্ত্রের আনন্দ যেটুকু লজ্জায় প্রকাশ পাচ্ছে সেটুকু তুমি কেড়ে নিও না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবদান যদি কালের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহলে লজ্জার স্থিতিতে আনন্দ কোথায়? সেই দিক দিয়ে এও অর্থ করা যায় যে, জীবসত্তা বলছেন, আমার অবদান সবই তোমারই হবে, তবে অবদানহীন অবস্থায় আমার রূপকে আমি নিজেই সহ্য করতে পারবো না, কাজেই আমার লজ্জাটুকু থাক আবরণ হিসেবে।

এবার

"সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী॥" (পুরস্কার)

কবিতাটি দীর্ঘাঙ্গের হলেও এখানে সোনার তরীর রূপটি ফুটে উঠেছে 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মতো। উদাসী দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবি নিজের বাড়ীতে বসে সৃষ্টি করে চলছিলেন তার কবিতা। স্ত্রী তাঁর সংসারের বাস্তব অনটনের কথা বলে রাজার কাছে গিয়ে কবিতা বলে পুরস্কার আনবার প্রস্তাব করলেন। কবির স্ত্রী চাইলেন বাস্তব সুখ, এদিকে, কবি জানেন না যে বাস্তব সুখ কাকে বলে আর দুঃখই বা কাকে বলে, কিন্তু এ দার্শনিক তত্ত্বটি গৃহিনী বুঝলেও সংসার বুঝবে না, তাই বাধ্য হয়ে কবিকে রাজার সভায় যেতে হলো। রাজার সভায় গিয়ে কবি দেখলেন বহু মান্যগণ্য প্রার্থীরা অর্থ, সোনা, রত্ন প্রভৃতি পাচ্ছে, কবি রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন না, শুধু দেখে গেলেন যে কত লোক জিনিষ নিয়ে খুসী হয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে চলে গেলে রাজা দেখলেন একজন লোক তখনও যায় নি, রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে তার খোঁজ করতে গেলেন—

"কবি কহি উঠে, "আমি কেহ নই"।
আমি শুধু এক কবি।"

কবি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন "শুধু এক কবি", এই "শুধু" কথাটি বিশেষভাবে সমস্ত কবিতার মূল রসকে ফুটিয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে।

সাধারণ জগতে মানুষরা কত রকমের এবং তাদের কত বিচিত্র পেশা এবং চাল চলন এসবই কবি দেখেছেন এতক্ষণ, এবং এও দেখেছেন যে কত রকমের লোক কত রকমভাবে টাকা নেয়. একজন আসে আর যায়, আবার একজন আসে এই আসা-যাওয়ার ভেতরে কবি দেখেছেন, রাজাকে যে যেরকমভাবে পারে সন্তুষ্ট করে তার বিনিময়ে পুরস্কার নিয়ে যায়।

কিন্তু কবি রাজাকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন, রাজাকে সন্তুষ্ট করার সম্পদ

কি তার এমন আছে, যা আছে তাতে রাজা হয়তো সন্তুষ্ট নাও হতে পারেন।

কিন্তু রাজা কবিকে ছাড়লেন না শেষকালে নিজের কাছে নির্জনে বসিয়ে কবিকে আবৃত্তি করতে বললেন কবিতা, নিরুপায় কবি সরস্বতীর বন্দনা করতে আরম্ভ করলেন, এই সরস্বতীর বন্দনার ভেতরে কবির উদাসীন দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীটি যেমন ধরা পড়ে, তেমন সেই সুরের সঙ্গে মিলেছে সোনার তরীর মূল সুর।

বিমলমানসসরসবাসিনী
শুক্ল বসনা শুভ্র হাসিনী
বীনা গুঞ্জিত মঞ্জু ভাষিনী।
কমলা কুঞ্জাসনা

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহ কোণে ধনমান হীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা!

চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া
আমি তব স্নেহ বচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ সুধা।

সেই মোর ভাল, সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী—
সুরের খাদ্যে জানো তো মা বাণী,
নরের মেটে না ক্ষুধা।”

যে কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করা হলো, এতে কবির উদাসীন দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে এবার সেই উদাসীর সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিলন দেখলাম যখন কবি 'রামায়ণ'এর ঘটনা ও তার পরিণতি দেখিয়ে 'মহাভারত'এর ঘটনা ও তার পরিণাম দেখালেন ;

কবি বলতে চাইলেন যে, রামচন্দ্রকে নিয়ে একদিন মানুষ কত কেঁদে ছিল, রামচন্দ্রও সীতার বিরহে কত কেঁদে ছিলেন, কিন্তু আজ সে সব দিন কোথায়, আজও সেই সরযু নদীর তীর পড়ে আছে পড়ে আছে দণ্ডকারণ্য, সেদিনকার কোনও ঘটনার চিহ্নই সেখানে নেই কিন্তু, আজও সেদিনকার স্মৃতি আছে মানুষের মনে।

তেমনি মহাভারত-এর কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ ও তার পরিণামে কেউই প্রত্যাশা অনুসারে সুখী হন নি। মহাভারতের সেদিন আজ নেই কিন্তু, আজকের মানুষেরও মনে আছে সেদিনকার সুর।

পুরস্কার কবিতাটির কালের ক্রিয়াশীলতার পরিচয়, সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যখন কবি বলে উঠলেন—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়—
নিমেষে প্রকাশে নিমেষে মিলায়
বালুকার পরে কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।

উপমায় কবি বলেছেন —

জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুঃখলাজ—
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

তারপর—

তোমার অমন কমল কমল গন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ—
অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব।

কবি সরস্বতীকে উপলক্ষ করে কেন এই কবিতাটি বলেছেন, সে আলোচনা এ কবিতার শেষার্ধে!

এবার কবিতার মর্মার্থ বলতে আরম্ভ করলেন—

হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক-দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি।

এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত
নব মেঘ ভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি।

এই যে বহু মানুষ অবিরত আসছে যাচ্ছে, অনেকে এই জীবন ক্ষণস্থায়ী জেনেও ভাল বা মন্দে হাসছে কাঁদছে। এসবের কোনও মূল্যই নেই, কারণ সংসারটা যদি মাত্র শুধু পান্থশালা হয়, তাহলে সে সংসারকে গভীরভাবে ভালবাসার কোনও অর্থই হয় না, কবিতায় কবি তাই বলছেন—

'অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বর তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশ হারা—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।'

শুধু পৃথিবীর মানুষ নয় সমস্ত সৌর জগতটাই চলছে, থামছে না, ফিরছে না। অতএব এখানে স্থায়িত্বের স্থায়ী আসন নেই। স্থায়িত্বও এখানে গতিশীল। আমরা যেমন কোনও জিনিষকে দেখে ভাবি এটা স্থায়ী একে কেন্দ্র করে সব ঘুরছে কিন্তু কবি বলছেন আমি যদি নিজে চলমান হই তাহলে স্থায়িকে দেখবো কি করে, কারণ স্থায়িত্বকে অনুভব করতে পারে স্থায়ী বস্তু, এখানে কেউ স্থায়ি নেই। কাল যদি চলমান হয় তাহলে বসে থাকা কথাটি এখানে তাই অনর্থক। এখানে স্থায়িত্ব নেই, আছে ক্ষণস্থায়িত্ব এবং সেই ক্ষণটুকুর ভেতরে ও গতিশীলতার প্রভাব ধরা পড়ে সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে।

কিন্তু এই গতিশীলতাই যেখানে প্রধান, সেখানে কবি তার কি অবদান দেবেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঘটনাগুলো দেখিয়ে, কবি কালের প্রবল প্রতাপকেই যদি স্বীকার করে নেন, তাহলে সেখানে কোন উদ্দেশ্য তিনি তার অবদান সৃষ্টি করবেন ?

ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আর একটুখানি নবীন আভায়
রঙ্গীন করিয়া দিব।

সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।

এখানে এই বিশেষ "আর একটুখানি" কথাটি বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের মূল সুরকে উল্লেখ করে কবি বলতে চেয়েছেন যে, সংসারে সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসা প্রভৃতি প্রত্যেকটি অনুভূতি ঘটনার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়, সেগুলো যেন জলের স্রোতের ওপরে ভেসে আসা ফুলের মত, ফুলের পর ফুল যেমন এসে চলে যায় এবং মাঝে মাঝে কোনও জায়গায় আটকালে তার কিছুটা বিশ্রাম ঘটে। তেমনি জলের স্রোতের সঙ্গেই সে ভেসে যায়। আবার কালের বুকে অবদানও কোনও স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। আমরা যখন ঘটনাকে বর্তমানের রূপে দেখি, তখন সেটাকে ঘাটে আটকে থাকা ফুলের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রে একটি কথা আছে যে— 'একোহং বহু স্যাম' আমি এক কিন্তু বহু হব। এ উক্তি ব্রহ্মের। প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্ম যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ তা হলে তার আবার ইচ্ছে হয় কেন? এবং ইচ্ছে মানেই অভাব। এ প্রশ্নের এই স্থূল উত্তরকে এড়িয়ে গিয়ে শাস্ত্র নিজেই উত্তরটি দিয়েছে। তার মর্মার্থ হলো যে সৃষ্টির পেছনে ব্রহ্মের যে মূল প্রেরণাটি রয়েছে, সেটা অভাবগত নয়, এখানে তার ইচ্ছেটা হ'ল খেয়াল মাত্র। সৃষ্টির ইচ্ছে যেমন খেয়াল, তেমনি সৃষ্টি নাশ করার মূলেও তার খেয়াল। এ খেয়াল কেন? সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার অধিকারী কেউ নেই, কারণ তার ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই বাস্তব জগত সৃষ্টি হয়েছে, বাস্তবতার মধ্যেই তার প্রকাশ, এই বাস্তবতার দর্শনে তিনি নিজেকে দেখতে ভালবাসেন বা বাস্তব রূপেই তিনি প্রকাশিত হতে চান।

সোনার তরীর কবিতাবলী ভাববাদী দর্শনের এই বিশেষ সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে। এখানে ব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কাল, যার বিনাশ নেই, প্রকৃতিসত্তার পেছনে ও ভেতরে কালের প্রচণ্ড প্রভাবই প্রকৃতির প্রাণ স্পন্দন ও সৃষ্টি রহস্যের কাজ করে চলেছে, এই সত্য।

সৃষ্টির স্থায়িত্ব নেই, কারণ কালের নিজেকে প্রতি ক্ষণে নতুন করে দেখার ইচ্ছে হয়.তাই প্রতি মুহূর্তে যা সৃষ্টি হয়, প্রতি মুহূর্তেই তার বিনাশ। এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা যে ছন্দে ও সুরে চলছে তার একটা কোন সূত্র আছে, সেটা তুলনা করা যেতে পারে মালার অদৃশ্য গোপন সূত্রের মতো। ওই সূত্রটিকেও যদি কালের সৃষ্টি বলি তা হলেও অন্যায় হবে না।

কবি বলতে চেয়েছেন, জানি অসীম কালের কাছে স্থায়িত্বের কোনও দাম নেই, কিন্তু চির প্রবাহিত কালের কাছে অবদানের মূল্য আছে কারণ, চলমান কালের খোরাক হলো অবদান আর জীবসত্ত্বা। তাই এই সত্যটুকু জানা আছে বলেই অবদানের প্রয়োজন আছে, সে অবদান একই হলে চলবে না, কারণ কাল পরিবর্ত্তনশীল, সে প্রতি মুহূর্ত্তকে প্রকৃতির সামনে ধরে দেয় নতুন অবদান আদায় করার লোভে, আর অবদান কথাটি যেখানে সত্যি সেখানে পুনরাবৃত্তি শব্দটি নিরর্থক। তাই—

> "সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
> রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
> দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
> তার পরে ছুটি নিব।"

জীবসত্ত্বার সৃষ্টি হয়েছে অবদানকে সৃষ্টি করার জন্যেই, অবদানটুকু কালের দ্বারা গৃহীত হলে জীবসত্ত্বা কোনও দরকার নেই এবং এক জীবসত্ত্বার একাধিক

অবদানকে জন্ম দিতে পারাটা বড় একটা সম্ভব নয়, কারণ জীবসত্ত্বার একটা পরমায়ু আছে।

রাজার কাছে কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তির প্রারম্ভে সরস্বতীর বর্ণনা করেছিলেন।

সাধারণ দিক দিয়ে বিচার করলে প্রাচীনকালে কবিতা আবৃত্তি করা বা লেখা এই দুটোরই গোড়াতে সরস্বরতীর বন্দনা করাটা প্রথা ছিল।

এক্ষেত্রে ঠিক সেই প্রথা অনুসারেই সরস্বতীর বর্ণনা করা হয়নি, প্রাচীন মতে এ প্রথা মানতে গেলে বন্দনাটি আগে করতে হয়, সেই বন্দনার ভেতরেই বর্ণনার বাণীটি স্পষ্ট থাকে, কিন্তু, এক্ষেত্রে আগে বর্ণনা ও কবিতা শেষে বন্দনা করা হয়েছে, যেমন —

"শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বাণী চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তর মাঝে—
আয়রে বৎস আয়,

তারপর —

সেই ভালো মাগো, যাক যাহা যায়,
জন্মের মতো বরিনু তোমায় ;
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বারবার নমো নমঃ।"

প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, কবিতার চিন্তাধারাটি যদি দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিতই হয়ে থাকে তা হলে সরস্বতীর বর্ণনাটি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয় কি ? স্থূল দৃষ্টিতে বিচার করলে হয়ত এ প্রশ্নের প্রশ্ন চিহ্নের পরে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিচারে সরস্বতীর বর্ণনা ও বন্দনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমে বন্দনা, তার ভেতরে ধ্যানের একাত্বতাটাই প্রকাশ পেয়েছে। তারপর কবিতার মধ্যখণ্ডে রামায়ণ ও মহাভারতের বিবরণ ও পরিণতি দেখিয়ে সিদ্ধান্তে কবি নিজের অবদানের মূল্য বিচার করছেন। নিজের অবদান ও কালের প্রভাবকে কবি বুঝতে পেরেছেন সরস্বতীর দয়ার তাই সরস্বতীর প্রভাবকে বলেছেন বারবার নমো নম।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন কালের পরিপ্রেক্ষীতে বিচার করলে সৃষ্টির কোন বস্তুই স্থায়ী হয়না। কিন্তু, কালের সঙ্গে জীবসত্বা ও অবদানের যোগাযোগ ও কালের সঙ্গে তাদের মূল্য বোধটির মাধ্যম একটা না থাকলে দার্শনিক উদারতা আসতে পারে না। এক্ষেত্রে সেই মাধ্যমটিই হোল জ্ঞানের প্রতীক মাত্র। যে প্রতীকটির প্রয়োজনীয়তাকে কবি শেষে স্বাকার করেছেন।

এর পর পুরষ্কার কবিতার রাজা কবিতার শেষে এত মুগ্ধ হলেন যে, কি দিয়ে কবিকে সন্তুষ্ট করবেন তা ভেবে পেলেন না তাই কবিতায় যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে, তোমাকে আমি কিই যে দেব ভেবে পাচ্ছি না, শুধু বলছি তুমি সুখে থাক, যদি তুমি চাও রাজ ভাণ্ডারে যা কিছু আছে সব এনে দিতে পারি তোমাকে।

"প্রেমোচ্ছ্বাসিত আনন্দ জলে
ভরি দু নয়ন কবি তারে বলে,
কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুল মালাখানি।"

সোনা মণিমুক্তা তিনি চাইলেন না কোনোও মূল্যবান জিনিষ চাইলেন না, চাইলেন রাজার গলায় ফুলের মালা। এইখানে এই ফুলের মালা চাইবার ভেতরে সোনার তরীর কবিতার মূল সুরটি স্পষ্ট বেজে উঠেছে।

সোনারতরীর এ আলোচনায় আগে একবার নদীর জলকে কালের প্রতীক

ও অবদানকে ভেসে আসা ফুল হিসেবে তুলনা করা হয়ে ছিল। পুরস্কার কবিতাটিতে সমস্ত স্বকীয়তা ও অবদান কালের প্রভাবিত বলে স্বীকার করা হয়েছে। কবি ওই কবিতায় দেখিয়েছেন পরিবর্তনশীল কালের বুকে জগত সৃষ্টিটাই যদি অস্থায়ী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আর সেক্ষেত্রে সোনা রূপা মণি মাণিক্যের দাম কি? কালের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে সৃষ্ট জগত আর ফুল দুটোরই এক দাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক জায়গায় আছে—

"ফাগুনের দিন যায় ঝরিয়া—
ফাগুনের অবসানে
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—
আর কিছু নাহি জানে।"

সমস্ত বিশ্ব চরাচরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরে ছিলেন যে, কালের স্রোতে সমস্ত সৃষ্টিই ভেসে চলেছে।

এখানে অবদানের মূল্য ঠিক জল থেকে ভেসে ওঠা বুদবুদের মতো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, যার ক্ষণিকের মূল্য আছে, তারপর অসীম কালস্রোতের বুকে তার সমাধি চির দিনের মতো।

এই যে অসীম কালটি যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি, সৃষ্টিসত্বার অস্তিত্বটি। কিন্তু, দুটোর ভেতরে তফাত হলো যে চিরস্থায়ী কালের গর্ভজাত হলো সৃষ্টিসত্বা, কিন্তু কাল ছাড়া তার অস্তিত্ব কল্পনাতীত।

প্রসঙ্গত দুটো উপমা দিলে নেহাত অন্যায় হবে না।

ভৃগু একদিন তার বাবা অরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্রহ্ম কী? অরুণ, উত্তরে বলে ছিলেন—

'যতো বা ইমানী ভূতানী জায়ন্তে
যেন জাতাগ্নি জীবন্তি
যৎ প্রযংতভি সংবিসন্তি
তৎভি জিজ্ঞাসাস্ব তৎ ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ মর্মার্থ হলো যে, যেখান থেকে জীবের সৃষ্টি যেখানে তার স্থিতি, আবার যেখানে তার লয়, সেইটেই ব্রহ্ম কিন্তু সোজা বলে দিলেন না ব্রহ্ম কি?

ভৃগু ভাবতে লাগলেন, অনেক ভেবে স্থির করলেন খাদ্যই ব্রহ্ম, কারণ খাদ্য থেকেই জীবনের উৎপত্তি আর তার অবস্থিতিও খাদ্যের মধ্যেই তার লয়।

বাবাকে যখন ভৃগু জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত, অরুণ আবার ঠিক সেই কথারই— পুনরাবৃত্তি করলেন। নিরাশ হয়ে, ভৃগু আবার চিন্তা করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন তার উত্তর উচ্চারিত হলো

'আনন্দা দ্ধেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দং জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রজংতভি সংবিশন্তি
আনন্দং ব্রহ্মতি ব্যাজনাৎ

অর্থাৎ আনন্দ থেকেই জীবনের উৎপত্তি, আনন্দের ভেতরেই তার স্থিতি, আবার আনন্দের ভেতরেই তার লয়।

এই দার্শনিক উপমাটির ভেতর আমরা যে সিদ্ধান্তটি পাই সেটা হলো

জীবন সত্বার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তিনটিই আনন্দকেই কেন্দ্র করে। আনন্দ ছাড়া জীব সত্বার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য।

কিন্তু জীবসত্বা আনন্দ জাতি হলেও সেই আনন্দ যখন স্বাকারে পরিণত হয়, তখন সেই ক্ষণস্থায়ীত্বের ভেতরে তার পৃথক সত্বাকে অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যাপতি ঠিক এই উপমাই দিয়েছেন নিজের ভাষায়।

"কত চতুরানন মরি মরি যায়ত
নতুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত
সাগর লহরী সমানা।"

কত ব্রহ্মা মরে যাচ্ছে, কিন্তু হে কৃষ্ণ, তোমার আদিও নেই অন্তও নেই। সমুদ্রের জল থেকে ঢেউ উঠে যেমন সেই সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়, তেমনি জীবসত্বার তোমার ভেতর থেকেই উৎপত্তি আবার তোমার ভেতরেই লয়। কিন্তু সমুদ্র আর ঢেউ এক হলেও অবস্থান্তরে ঢেউয়ের অস্থায়ী অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। দার্শনীক দৃষ্টি ভঙ্গীতে সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে কবি দেখেছেন চলমান, অস্থায়ীরূপে।

এই যে বিশেষভাবে বিশ্ব চরাচরকে দেখা, এর পরিপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় "যেতে নাহি দিব" "সমুদ্রের প্রতি" "পুরস্কার" কবিতা তিনটির মধ্যে।

সেই কবিতা তিনটির ভেতরে প্রকাশ পেয়েছে একটি হতাশার সুর, যেখানে করবার কিছু নেই, কাল এবং প্রকৃতি সত্বার ভেতরে যে বিরামহীন জন্ম মরণের স্রোত চলেছে সেই স্রোত থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে কবি এই স্রোতটিকে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু, আমি বলতে যে রবীন্দ্রনাথ এই চরম সত্যদ্রষ্টা, তিনিও তো প্রকৃতি সত্বার গর্ভজাত, সুতরাং প্রকৃতির সংঙ্গে তার নাড়ীর টান থাকাটা অস্বাভাবিক

নয়। ভাবদর্শনের মায়াবাদিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেও যে মানুষ বিশ্ব চরাচরের এই অনন্ত বিস্ময়কে ভালো বাসতে পারে, সে কবি সার্থক।

আমি জানি সব অস্থায়ী, কিন্তু ওই অস্থায়ীক্ষণের সৌন্দর্য্যকেই আমি ভালো-বাসি, আমি জ্ঞানে ভালোবাসছি। জানি, এ মরীচিকা কিন্তু আমি ভালোবাসি ওই মীরচিকার মোহকে। প্রকৃতিসত্তা ছাড়া বিরাট কালের রূপ আমার কল্পনাতীত, আমি প্রকৃতি জাত, আমি বসুন্ধরার একটি অস্থায়ী ক্ষুদ্রকণা আমার ভেতরে কালের প্রভাব আছে জানি। এবং এও জানি যে কালের প্রভাবে আমাকে লোকান্তরেও যেতে হতে পারে। কিন্তু আমি সেই পরিবর্ত্তনশীল কালের খেলার পাত্র হয়ে যেন এই পৃথিবীতেই বারবার জন্ম নিই। নিজেকে বিস্তার করে দিই এই পৃথিবীর মধ্যে। জল, গাছপালা, পাহাড়, পশুপাখী মানুষ যা হই না কেন, আমার জন্মান্তর যেন পৃথিবীর সীমাকে অতিক্রম না করে।

কিন্তু মিনতি কার কাছে করবো? কালের কাছে? কালতো শোনে সৃষ্টি সত্তার ভেতর দিয়ে, সেই সৃষ্টি সত্তার এক অংশ এই পৃথিবী, যেখানে বললে কাল হয়ত শুনতে পাবে, অতএব পৃথিবীকে লক্ষ করে আমার মিনতি।

> "আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে
> কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে
> বিপুল অঞ্চল তলে, ওগো মা মৃণ্ময়—
> তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
> দিগ্‌বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া—
> বসন্তের আনন্দের মতো।"

যদি আকাশের বুকে কোথাও থাকতে হয় তো সে আকাশ যেন পৃথিবীর আকাশ হয়।

"জননী, লহ গো মোরে
সঘন বন্ধন তব বাহুযুগে ধরে
আমারে করিয়া লহো তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ্ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও রাখিওনা দূরে ॥

প্রকৃতি সত্ত্বার সঙ্গে জীব সত্ত্বার যে নিবিড় সম্পর্ক, বসুন্ধরা কবিতাটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এর আগে ও "সমুদ্রের প্রতি" কবিতাটির ভেতরেও এই একই সুর শুনতে পাওয়া গিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলার আছে যে—কালের সঙ্গে জীবসত্ত্বার আর প্রকৃতি সত্ত্বার সঙ্গে জীবসত্ত্বার সম্পর্কের ভেতরে একটু তফাত আছে।

প্রকৃতি সত্ত্বার সঙ্গে জীব সত্ত্বার সম্পর্কটি অত্যন্ত মধুর, কিন্তু কালের সঙ্গে তার সম্পর্কটি দয়া ও করুণার সম্পর্ক। যদিও 'ঝুলন' 'দুই পাখী' 'প্রত্যাখ্যান' 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'হৃদয় যমুনা' প্রভৃতি কবিতাবলীতে জীবসত্ত্বা চেয়েছে কালের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতাবলীর ভেতরে সমুদ্রের প্রতি 'মানস সুন্দরী', 'বসুন্ধরা' কবিতাগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, জীবসত্ত্বা কতখানি গভীরভাবে ভালবেসেছে এই প্রকৃতি সত্ত্বাকে।

পরিণাম যেখানে অচেনার হাতে আর বাসা যেখানে নিত্য চেনা মাটির বুকে, সেখানে অচেনা দয়ার পাত্র, মাটি সেক্ষেত্রে অতি মায়ার নিবিড় বন্ধন। সেখানে বিশ্বগ্রাসী মহাপরিণাম কালের সঙ্গে জীবসত্ত্বা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু, প্রকৃতি সত্ত্বার সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কটি অবশ্যম্ভাবী।

সোনায় তরী কবিতালীর এবার অন্তঃর্ভাগ আলোচিত হচ্ছে। এই অন্তঃর্ভাগ আলোচনা করার আগে কয়টি কথা বলে নেওয়া দরকার, যে সোনার তরীর প্রথম দুটি ছত্রই হচ্ছে—

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরসা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।"

এই কবিতাটির পরিপ্রেক্ষণটাই বর্ষাকাল; তারপর শুধু 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'গান ভঙ্গ', 'দুই পাখী', 'প্রত্যাখ্যান', 'যেতে নাহি দিব', 'হৃদয় যমুনা' প্রভৃতি কবিতাগুলোর ভেতর বর্ষার রূপ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, অন্য প্রায় সব কবিতাগুলোর ভেতরেই বর্ষা, সমুদ্র আর নদীর মাধ্যমে, কবি জলকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছেন। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই জল, বর্ষা, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে সোনার তরীর মূল সুরের সম্পর্ক কি? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তে সহজে আসতে পারি, সেটা হলো, কালের প্রত্যক্ষ প্রতীক হিসেবে এখানে জলধারার প্রয়োজন। বিরাট নদীর স্রোতকে কবি বুঝিয়েছেন কালের অবিচ্ছিন্ন গতি-সত্তাকে। সমুদ্রের অসীমতায় তার সর্বগ্রাসী রূপটি বর্তমান, আর বর্ষার ভেতরে সৃষ্টিধ্বংসকারী কালের রূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বর্ষার অবিরাম ধারা, নদীর বিরামহীন স্রোত, আর সমুদ্রের গর্জন প্রভৃতি, কালের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সর্বগ্রাসী রূপটি স্পষ্ট করে প্রমাণ করে।

এই প্রবহমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন যে, জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে মাত্র একটি সত্যই চির অম্লান, তার নাম কাল।

কবি জনোচিত উদাসীন আর নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই চরম সত্যটুকু যে জানতে পেরেছিলেন, সোনার তরীর কবিতাবলীর ভেতরে তার প্রমাণ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

সোনার তরীর যে কয়টি কবিতার ভেতরে এই মূল সুরটি বেজে উঠেছে, তার সব কয়টির ভেতরে কাল প্রকৃতিসত্তা ও জীবসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কটিও বুঝতে পাবা যায়।

কবি জীবসত্তা হয়ে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন কালের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, ঝুলন কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু কাল যেখানে কর্তব্য পরায়ণ মাত্র, সেখানে জীবসত্তার সম্পর্ক স্থাপন করা আর না করার ভেতরে কি এসে যায়। এখানে ক্রোধ, মোহ, প্রেম আর দয়া, কোন কিছুর মধ্যে সেই কালের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা যায় না।

জীবসত্তা প্রকৃতির গর্ভজাত বলে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কটি নিবিড়; কিন্তু সমস্ত রূপের ভেতরে কালের প্রভাবে প্রকৃতিরও রূপ বদলে যাচ্ছে; তাই জীবসত্তার কাছে তার বহুরূপে আবির্ভাব। জীবসত্তা প্রকৃতির ভেতরে পেয়েছে বস্তুর সাধ, কারণ সে নিজেই বস্তুস্বরূপ তাই কালের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তনের ভেতরে জীবসত্তা বুঝতে পারলো যে, যাকে ধরে রাখতে ইচ্ছে হয় সেও চলে যায়। এখানে ধরে রাখার ইচ্ছাটাও যেমন স্বাভাবিক, তেমনি যাকে ধরে রাখতে চাইছে তার চলে যাওয়াটাও তেমনি স্বাভাবিক, জীবসত্তা যখন বুঝতে পারলো যে, প্রকৃতি আর তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী, তখন জীবসত্তা দেখলো চলমানতাকে। জীবসত্তা বুঝলো কালের অক্ষয় প্রভাবকে। কালের সঙ্গে প্রকৃতিসত্তার ও জীবসত্তার সম্পর্কটি খাদ্য ও খাদকের, এই চরম সত্যকে বুঝতে কবি আগে পারেন নি তাই সোনার তরী কবিতায় কবি কালকে বলেছেন,—

"এখন আমারে লহ করুণা করি।"

ওই কবিতায় সোনার তরীর মূল সুর বাজতে আরম্ভ হয়েছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ-ভাবে বেজে ওঠেনি।

সোনার তরী কবিতাবলীর ভেতরে আর একটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করতে পারা যায়, সেটা হলো মৃত্যু।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যুর উল্লেখ অনেক জায়গাতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে মৃত্যুর বর্ণনার একটা বৈশিষ্ট আছে।

সাধারণ জাগতিক মানুষের কাছে মৃত্যুটা ভয়াবহ, অবসম্ভাবী পরিণাম। মৃত্যু আত্মাকে দেহ-পিঞ্জর থেকে মুক্ত করে, গ্রাস করে। তাই জীবনের কাছে মৃত্যুটা আতংকময়। দেহাতীত জীবনের কথা শাস্ত্রের কথা, সাধনার কথা, ধর্মের কথা, সাধারণ মানুষ সে কথায় আস্থা রাখতে পারে না। সাধারণের কাছে, কালের বিশেষণ তাই পরিণামগ্রাসী।

এখানে কবি জানেন, কালের সর্বগ্রাসী রূপকে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তার মমতা।

জানি কাল সর্বগ্রাসী, কিন্তু প্রকৃতিকেও যে আমি ভালবাসী একথাও আমি জানি। এই দুই এর মিল হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তববাদী দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী আর ভাববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই দু পথই পৃথক।

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর শেষার্ধে কবি উন্মোচন করলেন নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী, যেখানে সোনার তরীর মূল সুরটি আছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী নতুন।

প্রকৃতিসত্ত্বার জাতক কবি নিজে, কালের সঙ্গে প্রণয় সূত্রে নিজেকে তিনি ধরা দিতে চান, এখানে কবির কালকে ভালবাসাটা প্রধান, কিন্তু প্রকৃতি-সত্ত্বার ওপর তার মায়াটিও লক্ষ্যনীয়।

মৃত্যু এখানে কালের অদৃশ্য রূপ—

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতিসত্ত্বার জাতক ও কালের প্রণয়িনী। কাল মৃত্যুর বেশে এসেছে কবির প্রাণকেন্দ্রকে হরণ করতে, কারণ প্রাণকেন্দ্রটিই এখানে তার অর্ঘ্য, তাকে সে অর্ঘ্য হয়তো কেউ দিতে চায়না কিন্তু সময় মত কাল আসে প্রকৃতিসত্ত্বার কাছ থেকে জোর করে তাকে কেড়ে নিতে।

এখানেও তার বিচ্যুতি ঘটেনি, 'প্রতীক্ষা' কবিতা তারই জীবন্ত প্রমাণ।

কবিতাটির মূল সুরটি ব্যক্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে যে উধৃতির প্রয়োজন হবে, সেখানে মূল কবিতাটির ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হবে না। যেখানে যেখানে সোনার তরীর মূল সুরটি বেজে উঠেছে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সেই সুরটিকে প্রমাণ করার জন্যে উধৃতির দরকার হবে। তাই কখন কখন কবিতাটি সোজা এগুবে আবার পিছিয়ে আসবে।

"ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা,
যেখানে নন্দন ছায় ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা।"

প্রকৃতিসত্তার সঙ্গে যে জীবসত্তাটি জড়িয়ে আছে ভালবাসার বন্ধনে, সে চায় আরও কিছুদিন থাকি। তাই মৃত্যুকে লক্ষ্য করে আর নিজের জীবনের পক্ষ নিয়ে কবি বলেছেন—

"চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়
থির নাহি বাঁধে,
মেলি নানা বর্ণপাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে।" ইত্যাদি,

তারপর
এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী পরে
এইসব মুহূর্তের খেলা,
এইসব দেখাশোনা আনাগোনা
ক্ষণিকের মেলা।

প্রাণপণ ভালবাসা এও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে তারপর দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন।

তুমি শুধু চিরস্থায়ী তুমি শুধু সীমা শূন্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম।

তবে মৃত্যু দূরে যাও এখনি দিও না ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর আমার দুদিন হতে
করিও না চুরি॥"

আজকের যে দুঃখ, সে দুঃখ যদি দুদিন পরে পেতেই হয়, তাহলে এই দুদিনের পার্থক্যের দরকার কি? রবীন্দ্রনাথ যে একথার উত্তর চমৎকার ভাবেই দিয়েছেন, সেটা এ কবিতার শেষে পাওয়া যাবে এবং তারপর তার আলোচনা হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি শঙ্খ,
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্য গভীরে।

সমাপ্ত হইবে কর্ম সংসার সংগ্রাম শেষে
জয় পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন 'পরে
ক্লান্ত অতিশয়।

দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায় যাবে
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রা পথে
প্রদীপ তারার।

শিয়রে শয়নে শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে।

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখিতে,
তৈলহীন দীপ শিখা নিভিয়া আসিবে ক্রমে
অর্দ্ধ রজনীতে।

উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গ ধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের।

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে
এস বরবেশে,
আমার পরাণ বধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে—

ধরিবে তোমার বাহু তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিও,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিও।"

"প্রতীক্ষা" কবিতায় কবি কালকে লক্ষ্য করে যে কথা কয়টি বলেছেন, সেগুলোর সব কয়টার উল্লেখ প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেখানে যেখানে সোনার তরীর সুর বেজে উঠেছে, মোটামুটিভাবে সেগুলো উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

ওই কবিতাটীর ভেতরে তিনি নিজে কালের প্রণয়িনী জীবসত্তা, সেই কালকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ পরাণ পক্ষীরে

যদি তাই হয়

ওগো মৃত্যু ওগো প্রিয়
তবু থাক কিছুকাল ভুবন মাঝারে,
এরই মাঝে বধু বেশে অনন্ত সাগর দেশে
লইও না তারে।

তারপর একটি চমৎকার উপমা—

তার কাছে পৃথিবীর-চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে—
কালকে কবি বোলেছেন—
অনন্ত সাগর

এবং জীবসত্ত্বা যদি সেই সাগরে মিশে যায় তা হলে পৃথিবীর স্মৃতিটুকু তুচ্ছ মনে হবে এখানে মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, প্রকৃতি সত্ত্বার ওপরে যদি জীবসত্ত্বার এতখানি টান, তা হলে তার স্মৃতিটা পরে তুচ্ছ মনে হবে কেন? এর উত্তর গভীরতম! কবি ভালবাসেন পৃথিবীকে কিন্তু অনুমানে বুঝতে পারছেন যে, কালের প্রচণ্ড খরস্রোতের মত কালের প্রভাব যদি সমস্ত প্রকৃতি-সত্ত্বাকেই প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে সেখানে জীবসত্ত্বার অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠা বাহুল্য মাত্র।

কবি জানেন এর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। চিরস্থায়ীর প্রভাবের কাছে ক্ষণস্থায়ীর অস্তিত্বটা সমুদ্রের একটি ঢেউএর মতোই মূল্যহীন।

তিনি দেখাচ্ছেন এই কালের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে যে প্রকৃতি সত্ত্বার জন্ম, তার অন্তর্ধান কালের ভেতরেই।

চিরকাল ধরে গতিময় কাল সৃষ্টি করে চলেছে, আর প্রতি মুহূর্তে সেই সৃষ্টিকে গ্রাস করে পাচ্ছে আত্মতৃপ্তি।

কবিমানস এই অখণ্ড চিরন্তন অবিসম্ভাবী খেলাকে উপলব্ধি করেছেন জ্ঞান দিয়ে। কিন্তু সত্য সব সময় মধুর হয় না, তাই কবি সেইভাবে এই খেলাটিকে চিন্তা না করে ভাবছেন, এই অবধারিত সত্যের সঙ্গে প্রণয় সূত্রে সম্পর্ক স্থাপন

করলে জীবসত্ত্বা হিসেবে হয়তো কিছুদিন আত্মতৃপ্তি হতে পারে, সেই কারণে জীবসত্ত্বার কাছে কালের এ আবির্ভাবকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, অপেক্ষা করতে বলেছেন।

কিন্তু কবি শেষে যা বলেছেন তার মর্মার্থ এই যে প্রকৃতির বুকে, আমি যেদিন সুখে ক্লান্ত হব, অর্থাৎ জীবন পাত্র যেদিন উপভোগ্যের মধুতে পূর্ণ হবে, সেদিন আমি হব ক্লান্ত, সেদিন আমাকে নতুন করে, তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যেদিন সেদিন আসবে, সেদিন তুমি এসো বরবেশে।

আর আমার পরাণ বধূ সে ক্লান্ত হাত দিয়ে তোমার হাত ধরবে। সেদিন তোমার মিলনের মন্ত্র পড়ে তুমি তাকে গ্রহণ কর, তার রঙীন প্রাণের রঙীন অধরোষ্ঠ দুটি তোমার নিবিড় চুম্বনে পাণ্ডু করে দিও।

তোমার সত্য স্পর্শ রঙীনকে করে রঙহীন। পাণ্ডু রঙ, রঙ হলেও রঙীন নয় সে রঙ হয়েও রঙএর বিপরীত রঙ।

সোনার তরী কবিতাবলীর যেখানে যেখানে মূল সুরগুলো বিভিন্নরূপে বেজে উঠেছে, সেগুলোর ধারাবাহিকতাগুলোকে রক্ষা করে প্রথম কবিতাটি থেকে প্রতীক্ষা কবিতাটি পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। যে দুই একটি কবিতা এখানে আলোচিত হয়নি, তাতে খুব ক্ষতি নেই বলে মনে হয়, কারণ সোনারতরীর মূল সুরটুকুকে দেখানই হলো উদ্দেশ্য। কবিতার রসোত্তীর্ণতা দেখানোর কাজ এ প্রবন্ধের নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অবদানের মৌলিকতা দেখানো বা রসোত্তীর্ণতা দেখানো খুব কম কথায় হয়তো সম্ভব হতে পারে কিন্তু সে কাজ সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্নমুখী সাহিত্যপ্রতিভা বিভিন্ন দিক দিয়ে সুপ্রকাশিত, কবিতা, গান, নাটক, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, বক্তৃতা আর ধর্ম বিষয়ক লেখা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমালোচক দ্বারা আলোচিত হয়েছে। সোনার তরীও আলোচনা হতে বাদ পড়েনি কিন্তু এ প্রবন্ধে সোনার তরী কবিতাবলীর প্রতি নতুন দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা হয়েছে। আর অন্য একটি বিশেষ কারণ হলো যে,

কবিতাবলীর ভেতরে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশেষভাবে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছেন, সেই বিশেষ দিকের বৈশিষ্টকে বহুলাংশ খুঁজে পাওয়া যায় সোনার তরীর ভেতরে এবং এই প্রবন্ধ লেখার কারণ সেই উদ্দেশ্যেই।

সোনারতরীর শেষ কবিতা "নিরুদ্দেশ যাত্রা"—

প্রসঙ্গ মনে রাখা দরকার যে, সোনারতরীর মূল সুরটি যেসব বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে, মোটামুটি তার ভাগ হলো সাতটি— ১। নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা, পরশ পাথর। ২। দুই পাখী, হৃদয় যমুনা, ঝুলন, প্রত্যাখ্যান, লজ্জা। ৩। গান ভঙ্গ, দুর্ব্বোধ। ৪। হিং টিং ছট। ৫। যেতে নাহি দিব, ব্যর্থ যৌবন, পুরস্কার। ৬। মানস সুন্দরী, সমুদ্রের প্রতি বসুন্ধরা। ৭। সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা।

৭ম ভাগের প্রথম কবিতা ও শেষ কবিতা দুটির মাঝখানে যে কয়টি কবিতায় বিভিন্ন সুর বেজে উঠেছে, এবং কাল প্রকৃতিসত্তা আর জীবসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কগুলো আলোচিত হয়েছে। সেগুলোকে আর শ্রেণী বিভক্ত করার দরকার নেই।

কিন্তু প্রথম কবিতায় জীব সত্ত্বার উক্তিটি পূর্ণতা লাভ করেছে সর্ব্বশেষ কবিতা নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এবার সেই শেষ কবিতা আলোচনা করে এ আলোচনা শেষ হবে।

"নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটির সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

সোনার তরী কবিতার ভেতরে মূল সুরটি হলো কালের দ্বারা প্রকৃতিসত্ত্বা ও প্রকৃতিসত্ত্বার দ্বারা জীবসত্ত্বা সৃষ্টি হলেও প্রকৃতিসত্ত্বা আর জীবসত্ত্বার ভেতরে যে পারস্পারিক সম্পর্কটি নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে, কালের সঙ্গে ওই দুই সত্ত্বার তেমন সম্পর্ক নেই।

কবি প্রথমে যখন বুঝতে পারলেন যে, জীবসত্ত্বার সৃষ্টি উপাদানটিই কালের পাওনা, তখন কালের কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন—

"এখন আমারে লহ করুণা করি ॥"

কিন্তু সে প্রার্থনা সেদিন নিষ্ফল হয়েছিল, তাই আক্ষেপ করে কবি বলেছিলেন—

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥"

কাল নিলো কবির অবদানকে, কবিকে নয়। কবি ভাবলেন, স্রষ্টার চেয়ে মূল্যবান, সৃষ্টি। কাল যাকে হরণ করছে, সেই—মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। স্রষ্টাকে ফেলে যখন তার সৃষ্ট অবদানটাকেই কাল নিয়ে গেল, তখন এ আক্ষেপ আর কার কাছে করবেন ?

এর পর "যেতে নাহি দিব" কবিতাটির ভেতরে কবি দেখেছেন যে, আসলে ওই অভিমানটাই ভুল, কাল সবকিছুকে নিয়ে নেয়, তবে সব সময় এক সঙ্গে নেয় এমন কথা নয়। কালের নিয়ম অনুসারে যাকে যখন দরকার তাকে নেয়। এখানে ঠিক দরকার বললে প্রকাশভঙ্গীটা অস্পষ্ট থেকে যাবে। এখানে একটা নিয়মানুবর্তিতার খেলা চলছে, সৃষ্টি, স্থিতি আর ধ্বংসের, কারণকর্তা হিসেবে দেববাদীরা একটা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপকে স্বীকার করেছেন অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি আর ধ্বংসের পেছনে আছে একটা বিরাট শক্তির ইচ্ছে, এ ইচ্ছে কেন, তার উত্তর নেই। শুধু ইচ্ছেটাই যে আছে এইটাই উত্তর বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ এই ইচ্ছা শক্তিকে সোনার তরীতে ঠিক দেব-

বাদীদের ইচ্ছা শক্তি হিসেবে ধরেননি, তিনি ধরেছেন কাল চলমান, এবং কালের সঙ্গে জড়িত এই বিশ্ব সংসার সমস্তই প্রতি মুহূর্ত জন্মাচ্ছে, থাকছে আর ধ্বংস হচ্ছে, আবার তার নতুন রূপ, নতুন খেলা।

কালের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই বিরামহীন সঙ্গমে যে অবদান সৃষ্টি হচ্ছে, তাকেও যেমন কাল হরণ করে, আবার বিশ্বপ্রকৃতি, জীবসত্ত্বা কেউই কালের প্রভাব মুক্ত নয়। এই সুরটি "যেতে নাহি দিব" কবিতায় ফুটে উঠেছে।

কি গম্ভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ত তীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে।'
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে।
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে।

প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জলন্ত আঁখিতে,
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে,
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ,
'দিব না দিব না যেতে' নাহি শুনে কেউ.
নাহি কোন সাড়া ॥

'যেতে নাহি দিব', কবিতাটির আলোচনায় সময় এতটা উধৃতির প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আলোচনার অন্তের দিকে সোনার তরীর, মূল সুরের বৈশিষ্ট্যকে আলোচনা করার জন্যে এক দীর্ঘাঙ্গ উধৃতির একান্ত প্রয়োজন হোল।

এখানে প্রকৃতিসত্বার বা জীবসত্বার যদি কালজয়ী অবস্থানের ইচ্ছে থাকে তো কালের কাছে তার কোন মূল্য নেই, কালের প্রভাবের কাছে এদের প্রভাব নগন্য।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে কবি দেখতে পেয়েছেন প্রজ্ঞাভারতীর কল্যাণে। প্রজ্ঞাভারতী জীবসত্বা গর্ভজাত হলেও প্রজ্ঞাভারতীরই কল্যাণে কবি ক্ষমতা লাভ করেছেন কালের এই সর্ব্বগ্রাসী রূপকে দর্শন করতে। প্রজ্ঞাভারতী হলো জীবসত্বার অন্তর্শক্তি।

'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির ভেতরে আমরা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করলাম যে, জীবসত্বা যখন তার অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে, তখন সে বুঝতে পেরেছে কালের শক্তিকে। এই বুঝবার পরের কাব্যানুভূতির প্রকাশ পাওয়া গেল 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির ভেতরে. আর সেই প্রকাশকে আরও স্পষ্ট করে পাওয়া গেল 'পুরস্কার' কবিতাটির ভেতরে।

কিন্তু জ্ঞান যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি সে জ্ঞানলাভের সঙ্গে যদি মানুষ প্রাকৃতিক বন্ধনের মায়াকে তুচ্ছ বলে না মনে করে তো তাহোলে জ্ঞানই আবার বেদনার কারণ হয়ে ওঠে।

আমি জানি এ ক্ষনস্থায়ীত্ব। এর স্থায়ী মূল্য কিছু নেই, কিন্তু, এ জানা সত্বেও প্রকৃতির মোহ আমি ত্যাগ করতে পারছি না। এই বিশেষ অনুভূতিই হোল দার্শনিক কাব্যানুভূতি।

এই অনুভূতি থেকে যে কবিতা জন্মালো, সেগুলোর নাম 'মানস সুন্দরী' 'সমুদ্রের প্রতি' আর 'বসুন্ধরা', কবিতা তিনটি। আর প্রকৃতিকে যদি ভালোবাসা যায়, তাহ'লে কালকে ভালোবাসা যাবে না কেন? কারণ কবি মনের ধর্মই হলো সকলকে ভালোবাসা। যেহেতু তা কাব্যধর্মি। এই পরি-প্রেক্ষিতে জন্মালো 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'লজ্জা', আর 'ব্যর্থ প্রেম', কবিতাগুলির ভেতরে কালের সঙ্গে জীবসত্বার মিলনের প্রচেষ্টার রূপটি স্পষ্ট।

'ঝুলন' কবিতাটিকে এক বিশেষ শ্রেণীর কবিতা বলা যেতে পারে, কালের সঙ্গে জীবসত্বা নিজের মিলনটি কল্পনা করে একটা উল্লসিত আনন্দ উপভোগ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু, সেটা সোনার তরীর সুরে বাজলেও সেখানে বৈশিষ্টটা স্পষ্ট নয়।

অন্য কবিতাগুলোর ভেতরে শ্রেণীগত একটা প্রভাব রয়েছে।

'সোনার তরী', 'ব্যর্থ যৌবন', আর 'প্রতীক্ষা' কবিতা তিনটে ছাড়া অন্য কবিতাবলীর মধ্যে শ্রেণীগত প্রভাব ছাড়া অন্য বিশেষ কোনও লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য নেই।

মূল সুরটি যেখানে চরমভাবে বেজে উঠেছে, সেট হোল নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায়।

এই কবিতাটির জোড়া কবিতা তুলনা করে বলতে পারা যায় যে, সোনার তরী কবিতা গ্রন্থের যেন দুটো প্রচ্ছদপট। একটি সামনে অপরটি পেছনে। সামনের প্রচ্ছদপট, যেখানে কবি কালের কাছে নিজের বেঁচে থাকবার প্রার্থনা করেছেন, সেই কবিই নিরুদ্দেশ যাত্রায় তার প্রার্থনাকে সিদ্ধিলাভ করার নিশানা পেয়েছেন

কবি প্রথমে দেখলেন যে, প্রার্থনা তার নিষ্ফল হয়েছে, তারপর কালের গতি বুঝে ভাবলেন নিস্ফল কিছুই নয়, কালের গতির ওপরে সমস্তই ভাসছে আর যাচ্ছে, এই ক্ষণস্থায়ীত্বটুকুর ভেতরে জীবসত্বা ও প্রকৃতিসত্বার ওপরে একটা স্বাভাবিক মায়া জন্মায় কিন্তু সেটা মূল্যহীন।

কবি দেখলেন, কালের ভোগ্যবস্তু সমগ্র বিশ্বচরাচর হলেও অবদানটিই প্রধান। যেমন ফসল উৎপাদানের ব্যাপারে তার প্রয়োজনীয় উপাদান মুখ্য নয়, গৌণ, তেমনি জীবসত্বা নিমিত্ত মাত্র হলেও তার সৃষ্ট অবদানটিই কালের হল প্রধান লক্ষ্য। এখানে ফসল উৎপাদনকারী কৃষকের ভূমিকার সংগে কালের ভূমিকা এক। কবি ভাবলেন আমি যদি আমার সৃষ্টির স্রষ্টা হই, তাহ'লে আমি কালের কাছে মূল্যহীন, কিন্তু আমি যদি নিজেই নিজের অবদান বলে পরিচয় দিই, যদি কালকে বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আমার সৃজনী ক্ষমতা আরও শক্তিশালী। তাহলে তোমার জঠর আমি পূর্ণ করতে পারি, কিন্তু আমাকে নিতে হবে অবদান হিসেবে এবং তোমার তরীতে আমি প্রতিষ্ঠিত হব আমার অবদান হিসেবে। তোমাতে আমাতে সম্পর্ক হবে অন্য, আমি অবদান তুমি অবদানগ্রহণকারী, তোমাকে ছাড়া বিচ্ছিন্ন বলে কিছু নেই, যা আছে তা পরিবর্তনীর বিশ্বের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, যার স্রষ্টা তুমি। তুমি আমার সৃষ্টির প্রেরণাময়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। মানস সুন্দরী কবিতায় তোমার যে রূপ দেখতে পেয়েছিলাম, সেখানে সম্পর্কটি প্রণয়ের ছিল, তাই দাবী ছিল না, আজ তোমার কাছে আমার দাবী—এ দাবী শুধু প্রণয়ের নয়, এ দাবী স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভিতরে পারস্পরিক দায়ী। তুমি যদি সৃষ্টিকর্তা হও

তো প্রকৃতিসত্বার উত্তরাধিকার সূত্রে সৃজনশক্তির পেয়েছ, এবং সেটা প্রকৃতির গর্ভজাত, আমার ভেতরেও যে সৃজনশক্তির বিকাশ দেখা গিয়েছে সেটাও আমার প্রকৃতিসত্বার কাছ থেকে পাওয়া—আমার সঙ্গে প্রকৃতিসত্বার সম্পর্কটি যেমন নিবিড় তেমনি ভেবেছিলাম যে, তোমার সঙ্গে প্রকৃতিসত্বার সম্পর্কটিও তেমনি। কিন্তু পরে দেখলাম স্রষ্টার সঙ্গে ভোক্তার সম্পর্কটির ভেতরে যে নিবিড়তাকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা প্রীতিমূলক নিঃস্বার্থক নয়, সেখানকার নিবিড়তার পেছনে রয়েছে একটা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি। প্রকৃতি তাই তোমার অর্ঘ মাত্র, প্রণয়িণী নয়। তাই সে প্রতি মুহূর্তে জন্মায় তোমার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে, আবার প্রতি মুহূর্তে সে তোমার ভেতরে লীন। তোমার সৃষ্টির তুমিই ভোক্তা। তুমি তোমার আহারকে আহার করার জন্যে আহার সৃষ্টি কর, তোমার পরিতৃপ্তি তাই তোমার সৃষ্টির ভেতরে।

প্রকৃতিকে আহার হিসেবে গ্রহণ করাটাই তোমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি প্রকৃতিকে সৃষ্টি কর জীবসত্বাকে সৃষ্টি করার জন্যে, আর জীবসত্বার ভেতর দিয়ে যে অবদান সৃষ্টি হয় সেইটেই তোমার লোভনীয় আহার। অবদানকে ভোগ করে তুমি প্রকৃতিসত্বার সৃজনশক্তিকে বেগবান কর, কারণ তার বেগের ভেতরে যে ক্রমবিকাশের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই ধারার ভেতর থেকেই জন্মায় তোমার আরও শক্তিশালী জীবসত্বা এবং সেই সূত্রেই অবদানও সৃষ্টি হয় আরও লোভনীয় রূপে। তোমার অনন্ত ক্ষুধার জঠর পূরণ করতে তাই প্রকৃতিসত্বা ও জীবসত্বা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে নিত্য নতুনত্বকে।

আসলে তুমি তোমার নিজেকেই আহার কর। এই আহারকে পৃথক কর তাকে নতুন করে গ্রহণ করবে বলে—

তোমার তৃপ্তির লাগি—
সৃষ্টি কভু থামে না তোমার
হে অতপ্ত জনম মরন খেলা
চলে অনিবার।

তোমার এই নতুনকে আস্বাদন করার মূলে রয়েছে তোমার জীবন্ত ইচ্ছাশক্তি। এখানে আমি তাই কেউ নয়, আমি মানে তুমি।

তোমার সঙ্গে পৃথক বলে আমি পার্থক্যের অধিকারী, তোমার ভেতরে লীন হলেও স্বত্বাহীন। তুমি চাও তোমার নিজেকে। এখানে তুমি অদ্বৈতবাদের পরমব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় আর আমি সে অদ্বৈতবাদের মায়া নেই, কায়া স্বপ্ন নই, সত্বা।

কিন্তু আমাকে সৃষ্টি করার পেছনে যেমন তোমার ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল, তেমনি আমি যখন সৃষ্টি লাভ করে সাতন্ত্রে পৃথক হোই, তখন আমার সেই পৃথক সত্বাটি চায় তোমাকে বুঝতে। জানি তুমি মহাপরিণাম কিন্তু স্বতন্ত্র হয়ে তোমাকে ভোগ করার যে সুখ আছে, তোমাতে লীন হলে সেটা পাওয়া যায় না। সেদিন ভোগ কথাটা অসম্ভব হয়ে যায়।

ঘুমিয়ে পড়া আর ঘুমকে উপলব্ধি করা আলাদা অনুভূতি। আমি ঘুমোবার আগে ঘুমকে উপলব্ধি করতে চাই, যেখানে আমার স্বাধীন সত্বা কাজ করে।

তুমি যেমন আমার কাছে তুমি, আমিও তেমনি তোমার কাছে তাই। কিন্তু, এখানে আমার দাবী আমি যদি অবদানের স্রষ্টা হই তাহ'লে আমার কাছে তোমার আত্মপ্রকাশ ঘটুক স্রষ্টার উদ্দিপনা হয়ে। তুমি এস সেই মানস সুন্দরীর সৌন্দর্য নিয়ে। এস তোমার সোনার তরী নিয়ে। আমি আজ তোমার কাছে অবদান হিসেবে তরীতে উঠব, তোমার সোনার তরীতে ওঠার ছাড়পত্রে আমি অবদান আর তরীর ওপর আমি আমার স্রষ্টা রূপ নিয়ে বিরাজিত। এবার চল। কিন্তু—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী

যখনই শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী—
বুঝিতে না পারি কি জানি কী আছে তোমার মনে ”

কালের তরীর ওপরে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ অবদান রূপে। কালকে তিনি দেখেছেন সুন্দরী রূপে। এখানে কালের সঙ্গে জীবসত্তার মিলন। কিন্তু, জীবসত্তা এখানে জীবসত্তা হিসেবে নেই, এখানে সে স্রষ্টা।

কাল এখানে স্রষ্টার অনুপ্রেরণা। পার্থক্য এই যে, জীবসত্তার স্রষ্টা হিসেবে স্থায়িত্ব ক্ষণকালের, আর স্রষ্টা হিসেবে কালের ক্ষমতা চিরকালের, কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ীত্বটুকুও মধুর হোক —

“বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায় অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধু যেন ছল ছল আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার,
ঊর্মি মুখর সাগরের পার
মেঘ চুম্বিত অস্তগিরির চরণ তলে ?
তুমি হাস শুধু মুখ পানে চেয়ে কথা না বলে॥”

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ, কালের সঙ্গে জীবসত্তার এই অভিসারটি দেখিয়ে, মূল সুরটি স্পষ্ট করে শুনিয়েছেন। তাই এর বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ মর্মার্থ হবে বটে, কিন্তু, তাতে মূল সুরটি ভাব পাওয়া যাবে।

এই সঙ্গে এটাও জানা দরকার যে, দুই পাখী কবিতাটি সোনার তরীর এই আলোচনায় দুইবার আলোচিত হয়েছে। একবার কবিতাটির মর্মার্থের ভেতরে সোনার তরীর মূল সুরটিকে পাওয়ার চেষ্টা অপরটি এই সোনার তরীর অন্য কবিতার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুই পাখীর আলোচনাটি আবার করতে হয়েছে, সেখানেও আসল দুই পাখী কবিতার মর্মার্থে যে আলোচনা করা হয়েছিল, দ্বিতীয়বারে তুলনামূলক বিচারে দুই পাখীর আলোচনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তৃতীয়বারে আলোচনা সূত্রে আবার তার আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রতীক্ষা কবিতায় কাল ও জীবসত্তার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, সেই সুরটি দুই পাখী ও নিরুদ্দেশ যাত্রায় ফুটে উঠেছে।

জীবসত্তা চাইছে কালের সঙ্গে সঙ্গে মিলতে কালও চাইছে জীবসত্তাকে, এখানে দুটোই যেমন পৃথক, আবার দুটোই তেমনি এক, কাজেই আকর্ষণটি এখানে স্বাভাবিক। সেটা জীবসত্তার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী মোহ হলেও সেই ক্ষণস্থায়ীত্বের একটা সত্তা আছে, যেহেতু সেটা আছে, অতএব তার মূল্যও আছে কিন্তু মূল্যটি কিসের? নিজেকে যখন জীবসত্তা কালের কাছ থেকে পৃথক করে দেখছে, তখন সে পার্থক্য চায় সত্তা নিয়ে অন্যের ভেতরে নিজেকে উপভোগ করতে।

'মানস সুন্দরী' কবিতায় তেমনি কাল ও জীবসত্তাকে পৃথক করে পাওয়া গিয়েছে। 'বনের পাখী' কাল, আর খাঁচার পাখী জীবসত্তা, উভয় চলেছে। খাঁচাটি প্রকৃতিসত্তা বললে নেহাত ভুল হবে না।

রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতাবলীর ভেতরে যে কথাটি বলেছেন তার মর্মার্থে এই পাওয়া যেতেও পারে যে, একদিকে কালের প্রচণ্ড চিরস্থায়ী বিশ্বগ্রাসী রূপ দেখে কবি তার কাছে দয়া ভিক্ষা করেছেন, দয়া মেলে নি।

তখন কালকে ভেবেছেন সুন্দরী, তাতেও আত্মতৃপ্তি হয়নি, তারপর প্রকৃতির কাছে তিনি নিজের আরাম চেয়েছেন, কিন্তু তাও হয় না, কারণ কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে প্রকৃতিসত্তাও ভোজ্য বস্তু. কবি কালকে প্রণয়ী হিসাবে দেখেছেন তাতেও আত্মতৃপ্তি হয়নি। তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি যা বলতে চেয়েছেন, গভীরভাবে আলোচনা করলে এই মনে হয় যে, উপাদানই যদি কালের উপাদেয় খাদ্য তাহ'লে আমি নিজে কালের কাছে অবদান হিসেবেই শুধু যাব না আমি যাব অবদানের স্রষ্টা হিসেবে কাল সেখানে সোনার তরীতে থাকবে আমার সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে।

এই হলো সোনার তরীর আসল ও শেষ সুর। এ সুর সোনার তরীর বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়লেও নিরুদ্দেশ যাত্রায় সে সুর চরমভাবে বেজে উঠেছে, সে কথা আগে আলোচিত হয়েছে। একথা আবার আলোচনা করার কারণ হলো যে, সোনার তরী কবিতাগুলির মূল সুরটি যেমন বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্নভাবে বেজে উঠেছে, সেই মূল সুরের অনেক বিভিন্ন দিক এই নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় ফুটে উঠেছে।

কবিতার উধৃতি করে দিলে তার পূর্ণাঙ্গ উধৃতির দরকার নেই। মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রার কয়েক পংক্তি দিলে কবিতাটির ভেতরকার রসোপলব্ধি করা সহজ হবে এবং পাঠকের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াবার আগে সোনার তরী পাঠকের সামনে দিয়ে চলে যাবে দূরে বহু দূরে।

"যখন প্রথমে ডেকেছিলে মোরে 'কে যাবে সাথে'—
চাহিনু বারেক তোমারে নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।

তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন—
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না বলে।”

এখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

“আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে”, এখানে কবির বাসনা হলো সেই প্রবহমান কালের স্রোতে তিনি চলতে থাকুন, কিন্তু কালকে তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন যে—

“আছে কি হোথায় নবীন জীবন”

অর্থাৎ কাল স্রোতের ভেতরে লীন না হয়ে যে মুখে কালস্রোত চলেছে, সে স্রোতের গন্তব্য স্থানে কি কোনদিন পৌঁছান সম্ভব ?

একটা বিশিষ্ট দিককে লক্ষ্য কোরে স্রোত চলে। লক্ষ্যহীন স্রোত অবাস্তব। সেই স্রোত যদি কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চলে তাহ'লে নিশ্চয়ই দিক বলে কোন একটা অজানিত বস্তুসত্তা রয়েছে এবং তাই যদি থাকে তাহ'লে কি সেখানে আশার স্বপ্ন সফল হবে ? সেখানে কি নতুন জীবন আছে ?

এ প্রশ্নের উত্তরটি খুব করুণ বাস্তব।

জীবসত্তা যতই স্রষ্টার রূপে কালের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক না কেন, যখন সে জীবসত্তা হিসেবে নিজেকে অনুভব করছে তখন তার একটা সীমিত পরমায়ু আছে এবং সেই সীমিত পরমায়ুর ভেতরে তার ঐশ্বর্য্যেরও একটা সীমা আছে। কালের সঙ্গে সে প্রণয়ী হিসেবে বা যে কোন হিসেবে

যতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক না কেন কালের অসীমতার অসীম ধৈর্য্য আছে। তার কাছে প্রকৃতিসত্ত্বা বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী। তাই যে স্রষ্টার দাবী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালের তরীতে নিজের ক্ষণস্থায়িত্বের দীর্ঘায়ু লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি সে সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি জীবসত্ত্বা ছাড়া আর কিছু নন। কল্পনায় সোনার তরীতে তিনি উঠলেন বটে, কাল তাকে নিলেও বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দাবীতে নয়, সে নিলো তার নিয়মানুসারে এবং যখন স্রষ্টার স্বরূপটির ম্লান হওয়ার সময় এল, তখন এল জীবসত্ত্বা হিসেবে তার অধৈর্য্যতা। জীবসত্ত্বা চায় নতুন জীবন। যে জীবনে সফলতা আছে। আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে সফল হতে দাও, আমাকে দীন কর কিন্তু— লীন করো না। জীবসত্ত্বার প্রতীক, রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসায় কাল কোন কথা বলেনি। শুধু হেসে ছিল।

'মুখ পানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না বলে॥'

তারপর—

“বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমির তলে?
হাসিতেছো তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না বলে॥”

কালকে জিজ্ঞাসা করছেন জীবসত্ত্বা, তুমি বলো এমন মৃত্যু সেখানে আছে কি যে মৃত্যু জীবনকে স্নিগ্ধ করে?

হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে মৃত্যুর কাছে জীবনের স্নিগ্ধতা চাওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়।

এর উত্তর হলো—

সর্বগ্রাসী কাল তার অখণ্ড সত্ত্বা নিয়ে জীবসত্ত্বাকে যখন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন এই ভেসে যাওয়ার ভেতরে সে আনন্দ পাচ্ছে না, এখানে কালের নীরবতা লক্ষ্য করছে, কালকে সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না, কারণ কালকে মানসসুন্দরী বধূ আর সুন্দরীর যাই বলে ডাকা যাক না কেন, আসলে যে ওটা আত্মতৃপ্তির জন্যে মনের কল্পনা সে বিষয় তো সন্দেহ নেই। কিন্তু জানা স্বত্ত্বেও জীবন চায় না সেভাবে চিন্তা করতে, জীবন চায় কালের বুকে তার সত্বার চিরস্থায়িত্ব। তাই নানাভাবে মনের ওপরে এই প্রলেপ দিয়ে কবি যেভাবে কালকে কল্পনা করেছেন, সেই প্রতিটি প্রলেপ হয়ে উঠেছে এক একটি কবিতা। আকারে আর প্রকারে স্বাতন্ত্রতা থাকুক না কেন, কিন্তু মূল একটি সুরই বেজেছে, আমার আমিই যদি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে, তার ভেতরে আনন্দ কোথায়? এই 'আমিকে' যে কাল হরণ করে তাকেই কবি অনেক বার অনেক ভাবে ডেকেছেন। পৃথিবীর প্রতি আর সমুদ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসার ভেতরে অশ্রুত সুরে শোনা গিয়েছে কালের সর্বগ্রাসী সত্বার প্রচণ্ড প্রভাবকে।

সেই কালের সঙ্গে মনের রাজ্যে কবি যখন সোনার তরীতে উঠলেন তখন সেখানেও তার শান্তি এলো না, তখন তিনি কালের কাছে চাইলেন জীবনের শান্তি, যে শান্তি জীবনকে করবে আনন্দিত, সে শান্তি যদি না থাকে তাহলে মৃত্যু যে মৃত্যু জীবনকে গ্রহণ করবে, করবে স্নিগ্ধ। আর চলমান কালের সঙ্গে আমি যেতে পারছি না, এবার আমাকে কোথাও নামিয়ে দাও, যেখানে হয় আমার জীবনের শান্তি হোক, না হলে মৃত্যুর কোলে সে জীবন হোক বিসর্জিত।

"ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি,
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি ॥"

জীবসত্তার কাছে কালের স্বরূপটি যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই শেষ ছত্রটি তার প্রমাণ।

সোনার তরীর মূল সুরটি বারবার করে আলোচনা করার কোনও দরকার নেই। তবে আলোচনা শেষ করতে হলে কয়টি কথা বলা দরকার, তা না হলে আলোচনা হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে রসহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সোনার তরীর কবিতাবলীর ভেতরে যে কথা বলেছেন সেটা হলো যে সৃষ্টির সত্তা বলতে যেমন আগে কোনও দিন ছিল না এবং পরেও কোন দিন থাকবে না কারণ প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি, স্থিতি আর ধ্বংসের খেলা চলছে চিরদিন ধরে। এ খেলার ভেতরে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি দুঃখও আছে এবং এই আনন্দ ও দুঃখের মূলসুরটুকু জীবসত্তা বুঝতে পারছে। আমি কার? আমি কে? আমার কি? আমি কোথায়? আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি কোথায় যাব? আমি থাকব, যদি না থাকি, কোথায় যাব? কেন যাব? আমার মূল্য কি? কে আমায় মূল্যবান করেছে? প্রকৃতিসহ', আমি এবং আমার অবদানের সঙ্গে কালের সম্পর্ক কি এবং কেন?

এই বিচিত্র প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সোনার তরীতে।

অদ্বৈতবাদ বস্তুকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলেছে, বস্তুবাদী সাংখ্যদর্শন বস্তুকে স্বীকার করেছে প্রকৃতি হিসেবে। বৌদ্ধদর্শনও প্রকৃতিকে মেনেছে, নির্বান অনুভূতিকে স্বীকার করেছে, কিন্তু অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেনি, সেটা সম্ভবও নয়; কারণ

অনুভূতিকে কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণকে চৈতন্য স্বরূপ বলেছেন আর রাধা সেই কৃষ্ণের মন্দির, তাই আগে রাধা পরে কৃষ্ণ অর্থাৎ আগে মন্দির পরে দেবতা।

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী যদিও অদ্বৈতবাদের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ভাববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে বিশ্ব চরাচরকে মায়া বলেছে রবীন্দ্রনাথ তা বলেন নি। কারণ সারবস্তু থেকে যার জন্ম সে মায়া হতে পারে না। এরা ক্ষণিকের জন্যে পৃথক কিন্তু সেই ক্ষণটুকুর মাধুর্যই অমূল্য।

অদ্বৈত বাদের একটি চরম মূল্যবান কথা হচ্ছে ব্রহ্ম ও বস্তু বলতে কি বোঝায় সে বিষয় কিছু বলে নি, কারণ যে বিশ্লেষণী মন দিয়ে আমরা ব্রহ্ম ও বস্তুর পার্থক্য বা অপার্থক্যকে বিচার করেছি সে বিচার কখনো নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বস্তুর আলোচনা করতে পারে না।

বেদান্ত সূত্রে আছে—

"একোহহং বহু স্যাম।"

অর্থাৎ আমি এক কিন্তু বহু হব এবং এই বিশেষ সৃষ্টির ইচ্ছে থেকে অখণ্ড ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পড়লেন।

বেদান্ত সূত্র এই বিভিন্ন সত্তার ভেতরে অখণ্ডকে কল্পনা করেছে তার নাম দিয়েছে "চিদাভাস"।

এখানে ব্রহ্মের ইচ্ছানুভূতি অভাবজনিত বলে পাচ্চে কোনও লোক তর্ক তোলে সেই জন্যে বলা আছে তাঁর লীলা, এর উদ্দেশ্য কি—জানা যায় না। এটা অস্বীকৃত হোক বা এ সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হোক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বেদান্তবাদীরা অনুমান প্রমাণে উপনীত হয়েই তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি ভূমি হলো অদ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তাধারা। সে বিষয় বোধ হয় কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু একটি সহজ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক যে, তাই যদি হয় তাহলে সোনার তরীর দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতরে বৈশিষ্টটা কি?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী দার্শনিক চিন্তার ভেতরে ব্রহ্ম ও মায়া পুরুষ আর প্রকৃতির ক্রিয়াগুলোকে প্রখরভাবে পাই। রবীন্দ্রনাথ তার সোনার তরীতে এই ক্রিয়াকে বড় করে দেখেছেন কিন্তু সোনার তরী কাব্যের ভেতরে পাওয়া গিয়েছে সেই দার্শনিক চিন্তাধারার কাব্যিক প্রকাশ। এখানে শুধু নেই দার্শনিক চিন্তাধারাটি। সোজা সরল ভাষায় গভীর কথা বলা হয়েছে। ক্রিয়াশীল প্রকৃতি আর মায়া তাই বাক্যমুখর আর প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ট সম্পর্কটিও কবিতার ভাষায় করেছে আত্মপ্রকাশ। যাকে সাংখ্যবাদী ও ব্রহ্মবাদীরা পুরুষ বা ব্রহ্ম বলেছেন, সোনার তরীতে সে মৃত্যুহীন কাল। ভাববাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রকৃতির কোনও বক্তব্য নেই, শুধু আছে এক এই অন্তহীন বিরাট শক্তির ক্লান্তিহীন সঞ্চয়। সেখানে প্রশ্ন উত্তরের কোনও অবকাশ নেই, নেই ভয় ভক্তির মূল্য।

কালের সঙ্গে প্রকৃতিসত্তা আর জীবসত্তার পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্ক যেখানে রস-মাধুর্য্যে লাভ করেছে পরম পরিণতি। সেই সম্পর্ককে কাব্যে মুখরিত করে যিনি রস-দর্শনের স্রষ্টা তার নাম সোনার তরীর রবীন্দ্রনাথ।